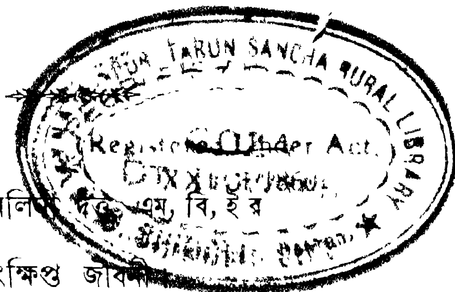
সরোজ-নলিনী



৺সরোজ-নলিনী দত্ত, এম, বি, ই র

সংক্ষিপ্ত জীবনী

—o—

তাঁহার স্বামী

শ্রীগুরুসদয় দত্ত, আই, সি, এস্

প্রণীত।

(কবিবর রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা-সম্বলিত)

—:-o-:—

প্রকাশক :—

দি বুক্ কোম্পানি,

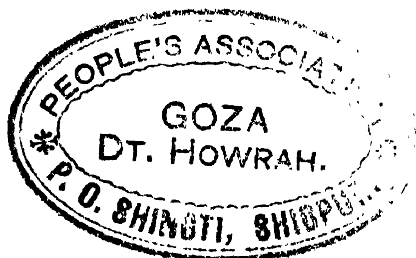
৪।৪এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

২৮ নং গঙ্গাধর বাবুর লেন, কলিকাতা,
চন্দ্র নাথ প্রেস্ হইতে
অতুল চন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

"আপনারে তুমি ফেলেছ মিশায়ে সবার মর্ম্মে মর্ম্মে
আপনারে তুমি দিয়েছ বিলায়ে দেশের সকল কর্ম্মে।"

"The reason firm, the temperate will,
Endurance, foresight, strength and skill ;
A perfect Woman, nobly plann'd
To warn, to comfort, and command ;
And yet a Spirit still, and bright
With something of an angel-light."

—*Wordsworth.*



এই পুস্তকের বিক্রয়-লব্ধ যাবতীয় অর্থ "সরোজনলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল-সমিতির" * ভাণ্ডারে দেওয়া হইবে।

কবি-গুরু শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় বইখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

স্বনাম-ধন্য চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় মলাটের সুন্দর পরিকল্পনাটি আঁকিয়া দিয়াছেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রায় সাহেব জগদানন্দ রায় মহাশয় এই পুস্তকখানা ছাপাইতে আমাকে সবিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের উভয়ের কাছেই আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আমার বিশ্বাস যে, বঙ্গদেশের প্রত্যেক গৃহে যদি সরোজনলিনীর এই সংক্ষিপ্ত জীবনীটি পৌছে ও সরোজনলিনীর সুন্দর সমন্বয়-পূর্ণ আদর্শে ঘরে ঘরে "সরোজনলিনী" গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে প্রত্যেক ঘরেই স্বর্গের সুখ ফুটিয়া উঠিবে।

সরোজনলিনীর সহিত যাঁহাদের পরিচয় ও বন্ধুতা ছিল, এই ক্ষুদ্র জীবনী রচনার সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সকলের সাহায্য গ্রহণের সুযোগ পাই নাই। আমার নিবেদন এই যে, সরোজনলিনীর জীবনের যদি কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁহাদের জানা থাকে বা কোনো উল্লেখযোগ্য পত্রাদি কাছে থাকে, আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে বাধিত হইব। পরবর্ত্তী সংস্করণে সেই সকল ঘটনার বিবরণ ও পত্রাদি পুস্তকে মুদ্রিত করিলে জীবনীটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে।

৫৮ নং চৌরঙ্গী, কলিকাতা।
২৩শে ডিসেম্বর, ১৯২৫।

শ্রীগুরুসদয় দত্ত।

* ৮ নং জ্যাক্‌সন্ লেন কলিকাতা, এই ঠিকানায় সমিতির সম্পাদকের নিকট চিঠি লিখিলে সমিতি-সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে।



সরোজনলিনী

রহিয়া গিয়াছিল এবং সেই সরলতা, কোমলতা, নম্রতা, অনাবিল মাধুর্য্য ও পবিত্রতা তিনি জীবনের সব পরিবর্ত্তনের, সব সংগ্রামের, সব কর্ম্মের ভিতর দিয়া অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন।

মাতাপিতার যত্ন করা তাঁহার বালিকা বয়সের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। প্রতিদিন রাত্রে তাঁহার পিতা বিছানায় শুইলে তাঁহার জুতার ভিতর বিছে বা সাপ না প্রবেশ করে সেজন্য জুতা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া একখানা চেয়ারের উপর রাখিতেন। তার পরে নিজে শুইতে যাইতেন। ইহা তাঁহার একটা নিত্তনৈমিত্তিক অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল।

আদর্শ পত্নী

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর উনিশ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। সে আজ ১৮ বৎসরের কথা। এই ১৮ বছর তিন মাস একান্ত অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য-ভাবে তিনি আমার জীবনসঙ্গিনী ছিলেন। বিবাহের দুই বৎসর পরে আমাদের পুত্রের জন্ম হইবার সময় তিনি তিন মাসের জন্য বাপের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন; আর একবার ছেলের অসুখ হওয়াতে তিন সপ্তাহের জন্য ডাক্তারের পরামর্শে নিতান্ত বাধ্য হইয়া ছেলেকে দার্জ্জিলিঙে হাওয়া পরিবর্ত্তনে লইয়া গিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া এই সওয়া-আঠার বৎসরের মধ্যে তিনি আমাকে ছাড়িয়া একা কোথাও যান্ নাই বলিলেই চলে। আমি ছাড়া তিনি কোথায়ও যাইতে বা কোন কাজ করিতে ভাল বাসিতেন না। এই ব্যবহারে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবগণ প্রায়ই তাঁহাকে ঠাট্টা করিতেন। তিনি লজ্জায় জড়সড় হইতেন কিন্তু অটল থাকিতেন। বস্তুতঃ তিনি সর্ব্বদা ছায়ার মত আমার অনুবর্ত্তিনী হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন।

আমি যখন পূর্ণিয়া জেলার কিশনগঞ্জ সব্ ডিভিসনে ছিলাম, তখন আমাকে প্রায়ই ঘোড়ায় চড়িয়া ৩০।৪০ মাইল ক্যাম্প বদলি করিতে হইত। সেখানকার খারাপ রাস্তায় গরুর গাড়ী ছাড়া আর কোন যান চলিত না। আমার পুত্র তখন শিশু ছিল। তাহাকে লইয়া তিনি অগত্যা গরুর গাড়ীতে চড়িয়া ৩০।৪০ মাইল প্রায়ই এক ক্যাম্প হইতে অন্য ক্যাম্পে আমার অনুবর্ত্তিনী হইতেন।

কেবল যে আমরা সর্ব্বদা একত্র ছিলাম তাহা নয়, আমি যে কোন কার্য্য করিতাম তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহাতে আমার সঙ্গিনী হইতেন। সেজন্য বিবাহের পরে আমার সাহায্যে ভাল রকমে অশ্বারোহণ অভ্যাস করিয়াছিলেন। ঘোড়া-চড়ায় এত দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি যে বড় ঘোড়াটায় চড়িতেন সে দুতিন বার আমাকে পিঠ হইতে ফেলিয়া দিয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে কখন ফেলিতে পারে নাই। আমাদের যখন মোটর গাড়ী ছিল না তখন কলিকাতার জনাকীর্ণ রাস্তায় অক্লেশে টম্ টম্ (ঘোড়ার গাড়ী) হাঁকাইয়াছেন; আমাদের মোটর হইবার পরে আমার পার্শ্বে বসিয়া মোটর হাঁকাইতেও শিখিয়াছিলেন। ৪ বৎসর কাল সবডিভিসনে থাকা কালীন আমরা উভয়ে প্রায়ই রোজ ২৫।৩০ মাইল একসঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া ক্যাম্প বদল করিয়াছি। টেনিস খেলা, গল্‌ফ্ খেলা, ব্রিজ খেলা ইত্যাদি সব ব্যাপারেই তিনি আমার সাথী হইতেন। টেনিস খেলা বিশেষ ভালবাসিতেন ও ইহাতে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতেন। ইংরেজ বাঙ্গালী উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব কম মহিলাই তাঁহার মত ভাল টেনিস খেলিতে পারিতেন। কলিকাতার অনেক উচ্চপদস্থ ইংরেজ ও বাঙ্গালী বন্ধু তাঁহার টেনিস খেলার প্রশংসা করিতেন। আমার সঙ্গে একত্র গলা মিশাইয়া ধর্ম্মসঙ্গীত ও অন্যান্য সঙ্গীত গান করিতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন ও গলার সুরের চর্চ্চা করিতে আমাকে উৎসাহিত করিতেন।

আমি যখন বাঘ-শীকারে নেপাল টেরাইতে হস্তিপৃষ্ঠে অথবা সুন্দরবনে পায়ে হাঁটিয়া গিয়াছি, তিনি প্রতিবার আমার সঙ্গিনী হইয়াছেন। আমি যখন পূর্ণিয়ার জঙ্গলে বড় বাঘ শীকার করি, তখনও জঙ্গলে হাতীর উপর আমার পার্শ্বে বসিয়া অসীম সাহসিকতার পরিচয়

অজ্ঞাতে বন্দুক লইয়া জঙ্গল বিভাগের সহকারী কন্‌সারভেটার মিঃ কাকপ্যাট্রিক মহাশয়ের সমভিব্যাহারে সুন্দরবনের দক্ষিণ সীমান্তে সমুদ্রবক্ষে নোঙ্গর করা আমাদের জাহাজ হইতে পায়ে হাঁটিয়া বাঘ শীকারে বাহির হইয়াছিলাম। তিনি পরে জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ জাহাজের কয়েকজন খালাসী সঙ্গে করিয়া পদব্রজে আমাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিলেন ও জঙ্গলে আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন।

একদিন খুলনার সুন্দরবনের নিবিড় জঙ্গলে আমাদের অনতিদূরে একটি বড় বাঘ গর্জ্জন করিতেছিল। আমরা লুক্কায়িত ভাবে জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে বন্দুক হাতে রাখিয়া গর্জ্জন অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম; তিনি নির্ভয়ে আমার পাশে হাঁটিয়া চলিয়াছিলেন। আর একদিন সন্ধ্যার পরে জঙ্গলে অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। একটা বাঘ আমাদের সন্ধান পাইয়া আমাদের অনতিদূরে পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিল। জঙ্গলে বাঘের অগ্রসর হওয়ার আওয়াজও আমরা পাইতেছিলাম। অন্ধকারে অদৃশ্য বাঘকে গুলি করিতে না পারিয়া তাহাকে ভয় দেখাইয়া অনুসরণে নিবৃত্ত করিবার জন্য আমরা পুনঃ পুনঃ বন্দুকের আওয়াজ করিতে লাগিলাম। তিনি সেই ভীষণ বিপদের মধ্যে অসীম সাহস দেখাইয়া আমার পাশে প্রাণ হাতে করিয়া চলিয়াছিলেন।

চারি বৎসর পূর্ব্বে আমার যখন বিলাতে এপেনডিসাইটিস্ (appendicitis) রোগ হয় তখন আমাকে অত্যাশ্চর্য্য সাহস প্রদর্শন করিয়া তিনি ডাক্তারের কাছে লইয়া গিয়াছিলেন ও নার্সিংহোমে (Nursing Home) আমার অপারেশনের (Operation) সময় ও তার পরে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিনের পর দিন

সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। সেই বন্ধুহীন বিদেশে তিনি সাবিত্রী-তুল্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, একনিষ্ঠা ও সাহসের সহিত রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমাকে রোগ-মুক্ত করিয়াছিলেন। বিপদে তাঁহার নির্ভীকতা অসাধারণ-ভাবে ফুটিয়া উঠিত।

যে হোটেলে তিনি থাকিতেন সেখান হইতে নার্সিংহোমে আসিতে হইলে প্রথমতঃ সিকি মাইল খানিক রাস্তা হাঁটিয়া ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে ধরিতে হইত। তার পরে ভিক্টোরিয়া ষ্টেসনে ভূগর্ভ হইতে উপরে উঠিয়া কয়েকটি জনাকীর্ণ রাস্তা অতিক্রম করার পরে ট্রামে উঠিতে হইত এবং ট্রাম হইতে নামিয়া আবার কিয়দ্দূর হাঁটিয়া যাইতে হইত। এই রকম ভাবে জনাকীর্ণ বিশাল লণ্ডন সহরে তাঁহাকে তিন সপ্তাহকাল প্রতিদিন দুইবার একা যাইতে ও দুইবার একা আসিতে হইত; তিনি নির্ভয়ে অম্লান-বদনে যাওয়া-আসা করিতেন।

এই সময়কার একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ইহা হইতে লণ্ডনের ঐ অংশটি কি রকম ভীষণ জনাকীর্ণ ও বিপদসঙ্কুল তাহা বুঝা যাইবে, আবার লণ্ডনের ইংরেজ পুলিস কনেষ্টবলদের সৌজন্য ও সহৃদয়তারও আভাস পাওয়া যাইবে। আমাদের পুত্র বীরেন্দ্রসদয় সে সময় লণ্ডনের বাহিরে ওয়েব্রিজ নামক স্থানে বোর্ডিং স্কুলে পড়িত। সে একদিন আমাকে দেখিবার জন্য আসে। সরোজনলিনী পুত্রসহ আমাকে দেখিয়া সেদিন সকালবেলা হোটেলে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। ভিক্টোরিয়া ষ্টেসনের অনতিদূরে ভাকস্‌হল্ (Vauxhall) এর ট্রাম হইতে নামিবার সময় বিশাল জনতার মধ্যে মাতাপুত্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একজন অপরকে খুঁজিয়া পাইলেন না। শেষটা বীরেন্দ্রসদয় একজন ইংরেজ কনেষ্টবলকে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকট ব্যাকুল ভাবে গিয়া বলিল—"আমার মা কোথায়? তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি না!"

পুলিস কনেষ্টবল তৎক্ষণাৎ বীরেন্দ্রনাথকে অভয় প্রদান করিয়া চারিদিকে খুঁজিয়া সরোজনলিনীকে দেখিতে পাইল ও তাঁহার কাছে পুত্রকে আনিয়া দিয়া বলিল—"এই নিন্ আপনার ছেলেকে। সে যখন আমার কাছে ব্যাকুল ভাবে আসিয়া বলিল, 'আমার মা কোথায়?' তখন তার সেই কাতর ধ্বনি একেবাবে আমার বুকে গিয়া বাজিল ও আমার নিজের মার কথা মনে পড়িল। তার কথাগুলি আমাব বড় মিষ্ট লাগিয়াছিল।" সরোজনলিনী কনেষ্টবলকে অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তথা হইতে ভূগর্ভস্থ বেল চড়িয়া হোটেলে ফিরিলেন।

আমাব একটি বিশেষ বন্ধু সরোজনলিনীর পরলোক-গমনের পর লিখিয়াছেন—"আমাব কাছে তিনি আদর্শ দেবীপ্রতিমা ছিলেন। আপনি বিলাতে গিয়া এপেন্‌ডিসাইটিস্ রোগের জন্য যে অস্ত্র-চিকিৎসা করাইয়াছিলেন তাহার কথা আমার নিকট বলিবার সময় তাঁর চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল হয়ে উঠিয়াছিল ও বেদনায় চোখের জল ছল্ ছল্ করিতেছিল। আপনাব মূর্চ্ছাব অবস্থা বছর খানেক পরেও স্মরণ করিতে গিয়া যেন তাঁহাব ঠিক সেই সময়কার ব্যাকুলতা দেখিয়াছি।"

আমাদেব বীবভূম থাকাব কালীন একদিন রাত্রে আমাদের বাড়ীর পশ্চিমে দুই মাইল দূরে একটা বস্তিতে আগুন লাগিল। আমি বাড়ী হইতে সেই আগুন দেখিতে পাইয়া মোটর করিয়া যাইতে প্রস্তুত দেখিয়া সরোজনলিনী আপত্তি উপেক্ষা করিয়া আমার সঙ্গিনী হইলেন। রাস্তায় মোটর ছাড়িয়া প্রায় আধমাইল পথ ধানক্ষেতের ও আইলের উপর দিয়া অন্ধকারে আমার সঙ্গে হাঁটিয়া গেলেন এবং আমার সঙ্গে বস্তিতে প্রবেশ করিয়া আগুন নিবাইবার কাজে নিজ হাতে সহায়তা করিতে লাগিলেন। জ্বলন্ত চালার একটা অংশ আমার উপর পড়িতেছিল, ইহা দেখিতে

পাইয়া অতিশয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সহকারে আমাকে তৎক্ষণাৎ টানিয়া নিরাপদ জায়গায় লইয়া আসিলেন।

আমি আফিসে ও কর্ম্মজীবনে কি কি কাজ করিতাম তাহাব খবর তিনি সর্ব্বদা লইতেন ও সময়মত তাহাকে না বলিলে দুঃখিত হইতেন। এমন কি, আমার কাজে প্রাইভেট সেক্রেটারীর মত প্রয়োজনানুযায়ী আমাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে নিজে টাইপরাইটিং অভ্যাস করিতেন। আমার কর্ম্মজীবনে তিনি আমাকে যে কত সাহায্য করিয়াছেন তাহা এখানে বলা অসম্ভব। আমার উৎসাহ উদ্যম সবই আমি তাঁহার কাছে লইতাম ও চাহিতাম। আমার প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার সাদর সহানুভূতি ও সাহচর্য্য আমার কার্য্য মাত্রকেই আনন্দে পরিণত করিয়া তুলিত। কখনো আমার কাজে কোন খটকা লাগিলে তিনি আমার মুখ দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিতেন এবং আমার কাজের সমস্যার কথা আমার কাছে জানিয়া তাহার সমাধান করার সুবুদ্ধি দিতেন। তাঁহার পরামর্শে কখনও ভুল হয় নাই।

আমার জীবনের প্রধান প্রধান সমস্যায় তাঁহার উপদেশই সকলের অপেক্ষা কাজে লাগিয়াছে। বঙ্গবিচ্ছেদ রদ হইবার আগে আমি বিহার অঞ্চলে ছিলাম। বঙ্গবিচ্ছেদ রদ হইয়া যখন বিহার একটা আলাদা প্রদেশ হইল তখন আমাব ইচ্ছা ছিল বিহারেই থাকি, কেননা সেখানে প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই নানাপ্রকার শীকার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমি তখন বড শীকার-প্রিয় ছিলাম। তিনি বলিলেন—"দেখ, সমস্ত জীবন ত আর শীকার লইয়া থাকিবে না। নিজের প্রদেশের লোকের সঙ্গে তোমার বেশী জানাশুনা আছে, বাংলাভাষা তোমার মাতৃভাষা, সুতরাং বাংলাদেশেই কাজ করা উচিত। তাহা হইলে দেশের অনেক কাজ করিতে পারিবে।" আমি শেষে তাঁহার উপদেশই গ্রহণ করিয়াছিলাম।



আমজোড় সমিতির বাঁধ পরিদর্শন

১৩পৃঃ



রুক্‌নিখাল সমিতির জলসেচন-প্রণালী পরিদর্শন

আমার প্রত্যেক কাজ ও প্রত্যেক চিন্তার মধ্যে নিজেকে ঢালিয়া দিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকিতেন। আমি যখন কোন কাজে দুই-এক দিনের জন্যও বাহিরে যাইতাম, ফিরিয়া আসিলে বলিতেন, "তুমি না থাকিলে আমার নিজেকে কেমন যেন অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। তোমার 'সরোর' সব শক্তিই যেন তুমি!"



আদর্শ গৃহিণী

ঘরকন্নায় সরোজনলিনী অসাধারণভাবে সুপটু ছিলেন। তাঁহার মার নিকট হইতে বিশেষভাবে সুস্বাদু ব্যঞ্জন ও মিষ্টি তৈয়ার করা শিখিয়াছিলেন ও এমন দিন ছিল না যেদিন তিনি অন্ততঃ একটি ব্যঞ্জন ও কিছু মিষ্টি তৈয়ার না করিতেন। রোজ অন্ততঃ আধ ঘণ্টা কাল নিজের "গুদামে" (ভাণ্ডার ঘরে) কুট্‌নো কুটিতেন। এ কাজের কখনও অন্যথা হইত না। বাড়ী-ঘর পরিষ্কার রাখা, চাকরদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা এবং বিশেষভাবে রান্না ঘর, বাসন ধোবার ঘর ও খাবার ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রোজ নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। চাকররা যখন কাজ ভাল করিত না, তখন তিনি অনেক সময় নিজেই ঝাড়ু হাতে লইয়া ঘর পরিষ্কার করিতেন। নিজের বাড়ী-ঘর তিনি অতি অল্প ব্যয়ে সুন্দর করিয়া সাজাইতেন। তাঁহার বাড়ী সাজাইবার সুরুচি ও মাধুর্য্য এবং দেশীয় ও পাশ্চাত্য উভয় প্রথানুযায়ী অতিথি-সৎকারে তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব ইংরেজ বাঙ্গালী, ছোট বড়, সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিত। নানাবিধ গৃহশিল্প চিত্র-শিল্প ও সেলাইয়ের কাজ তিনি বিবাহের পর নিজে-নিজে শিখিয়াছিলেন ও তাহাতেও বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর আমার ও ছেলের জন্য ও তাঁহার পিতার জন্য অন্ততঃ একটি উলের (পশমের) গেঞ্জি, কি মোজা, কি এক জোড়া শ্লিপার নিজের হাতে বুনিতেন। তাঁহার পরলোক-গমনের সময়ে এই রকম তিন-চারিটি আরব্ধ বুনার কাজ অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে মুহূর্ত্ত কালের জন্যও অলসভাবে বসিয়া থাকিতে কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই। যখন

বাড়ীতে বিশ্রাম করিতেন অথবা ট্রেণে কোথাও যাইতেন, তখনও তাঁহার হাত দু'টি কোন প্রকার সূচি-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। বাড়ীর সব পরদা, মেজেব চাদর ইত্যাদি তিনি নিজেব হাতে সুন্দর করিয়া সূচি ও চিত্রশিল্পে অলঙ্কৃত করিয়া তৈয়ার কারতেন। এ সব জিনিস আমাকে কিনিতে হইত না। তাঁহার হাতের নানাপ্রকার কারুকার্য্যের বৈচিত্র্য ও রুচিমাধুর্য্য দেখিয়া ইংরেজ, বাঙ্গালী, জাপানী বন্ধুমাত্রেই মুগ্ধ হইতেন। প্রত্যেক জিনিসে ও প্রত্যেক কাজেই যেন তাঁহার অন্তরের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য ও আনন্দ ফুটিয়া উঠিত।

মফঃস্বলে ১৭ বৎসর থাকা কালে আমাদিগকে প্রতি সপ্তাহে দুই-তিন বাব ইংরেজ বন্ধুদিগকে চা-পান, ডিনার অথবা টেনিস্ খেলা ইত্যাদিতে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হইয়াছে। সরোজনলিনী খাওয়া-দাওয়ার জিনিস খরিদ করা হইতে আরম্ভ করিয়া একদিকে রান্নাবাড়া দেখা ও মিষ্টি ইত্যাদি তৈয়ার করা ও অপরদিকে টেবিল সাজানো ও টেবিলে ফুল সাজানো ইত্যাদি কাজ নিজে করিতেন। কেবল খাওয়ানো-দাওয়ানো ব্যাপারে নয়, কথাবার্ত্তা বলিয়া সকলকে আমোদে ব্যাপৃত রাখিতেও তিনি অসাধারণ নিপুণতা প্রকাশ করিতেন ও ঘরকন্না হইতে আরম্ভ করিয়া রাজনীতি সমাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে অক্লেশে সকলের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে পারিতেন।

আমাদের বিলাত-ভ্রমণের সময়ে ইংলণ্ডে একদিন অনেক বিশিষ্ট ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা বন্ধু এবং শ্রীযুক্ত সুনীতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কতিপয় বাঙ্গালী বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ানো হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে তাঁহার অতিথি-সৎকারে ও আমোদ-আহ্লাদ-বর্দ্ধনে নিপুণতা দেখিয়া একজন ইংরেজ বন্ধু বলেন —

"মিসেস্ দত্ত, আপনি আমাদের দেশে আসিয়া কি করিয়া অতিথি-সৎকার করিতে হয় তাহা আমাদিগকে শিখাইতেছেন!"

বঙ্গের শিক্ষাবিভাগের ভূতপূর্ব্ব সুপণ্ডিত ডিরেক্টর পরলোকগত টি, ও, ডি, ডান্ (Dr. T. O. D. Dunn) মহাশয় একবার বীরভূমে স্কুলপরিদর্শনে আসাকালীন আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া খাইয়াছিলেন। তিনি সেই উপলক্ষে সরোজনলিনীর অতিথি-সৎকারে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তার পরে যখনই কাহারও সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধে কথা হইত, তখনই বলিতেন এমন সুন্দর অতিথি-সৎকার তিনি আর কখনও দেখেন নাই। ৪ বৎসর পূর্ব্বে যখন বিলাতে আমাদের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয় তখনও তাঁহার ইংরেজ বন্ধু-বান্ধবদের কাছে এই কথাই বলিয়াছিলেন।

গত বৎসর গ্রীষ্মের সময় আমরা দারজিলিংএ দেড় মাসের জন্য একটি বাড়ী লইয়াছিলাম। এই অল্প সময়ের মধ্যেই সরোজনলিনী অতি নিপুণভাবে বাড়ী গুছাইয়া ইংরাজ ও বাঙ্গালী বন্ধুদিগকে সেখানে খাওয়াইতেন। একদিন শ্রীযুক্ত স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লেডী মুখার্জ্জি এবং কতিপয় উচ্চতম ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী ও তাঁহাদের স্ত্রী আমাদের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন-ভোজন করেন। আহার ও আলাপের পর ইংরাজ পুরুষ ও মহিলা বন্ধুরা চলিয়া গেলে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সরোজনলিনীকে বলেন—"আপনার অতিথি-সৎকারের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতার বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বাঙ্গালী রমণী যে পাশ্চাত্য প্রণালীতে অতিথিসৎকারেও এমন চমৎকার নিপুণতা দেখাইতে পারেন ইহা বড়ই গৌরবের কথা।"

এক দিকে যেমন মাতৃভাষায় তাঁহার সম্যক্ শ্রদ্ধা ও দক্ষতা ছিল, অপর দিকে তিনি ইংরেজী ভাষাতেও সুন্দর ও সহজভাবে কথা বলিতে ও

লিখিতে পারিতেন। আমার একটি ইংরাজ সিভিলিয়ান বন্ধু বলিয়াছিলেন, "মিসেস দত্তের ইংরেজীর উচ্চারণ ও বলিবার ধরণ তাঁর স্বামীর চেয়ে ভাল।" এত সুন্দর ইংরেজী বলার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি বাঙ্গালীর সঙ্গে বাংলা ভাষাতেই কথা বলা ও চিঠি লেখা পছন্দ করিতেন।

তাঁহার বাল্যজীবনে স্কুলে শিক্ষার অভাবে যে সব শিক্ষা অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছিল সেগুলি কিছু কিছু করিয়া আমার কাছে অতি পরিশ্রমের সহিত শিখিতেন এবং কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ আমাকে "গুরুদেব" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইতিহাস, রাজনীতি, বাংলা ও ইংরেজী ব্যাকরণ, সন্ধি, সমাস ইত্যাদি নানা বিষয়ে রীতিমত পাঠ তিনি আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিতেন এবং অতি যত্নের সহিত খাতায় সেগুলি শেষ করিয়া আমাকে দেখাইতেন। পারিবারিক ও সামাজিক শত শত কর্ম্মের মধ্যে কি করিয়া যে তিনি এসব পড়া করিবার সময় করিতেন তাহা ভাবিয়া আমি আশ্চর্য্য হইতাম।

তিন বৎসর পূর্ব্বে, বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় অসুস্থ শরীর লইয়া তিনি Botsford এর History of the World (পৃথিবীর ইতিহাস) নামক বইখানা জাহাজে আগাগোড়া পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহার পুরস্কার-স্বরূপ আমি সিলোনে (সিংহল) জাহাজ পৌঁছাইবার পর তাঁহাকে একটি ওপেল (Opal) পাথরের গলার হার উপহার দিয়াছিলাম।

ঘরকন্নার হিসাব তিনি রোজ অতি সাবধানে রাখিতেন। যখনই কিছু খরচ করিতেন তখনই হিসাবের বইতে টুকিয়া রাখিতেন। হিসাবের বই কাছে না থাকিলে এক টুকরা কাগজে লিখিয়া রাখিতেন, পাছে ভুলিয়া যান। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা দৈনন্দিন হিসাব খাতায় লিখিতেন ও মাসের

শেষে হিসাবের এক পয়সা অমিল হইলে ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন ও যতক্ষণ পর্য্যন্ত হিসাব একবারে কড়ায় গণ্ডায় না মিলিত ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হইতেন না। হিসাবের বইখানা সঙ্গে না লইয়া কখনও কোথাও এক দিনের জন্যও যাইতেন না। আমি ঠাট্টা করিয়া তাঁহার হিসাবের খাতাকে "ভূতেব কাঁথা" বলিতাম। আমি ক্যাম্পে অথবা অন্য কোথাও গেলে আমাকে নিজের হিসাব লিখিয়া রাখিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ও পীড়াপীড়ি করিতেন ও হিসাব না লিখিলে ক্ষুণ্ণ হইতেন। তিনি এই ১৮ বৎসর ৩ মাস কালে একটি পয়সা অপব্যয় হইতে দেন নাই। জিনিসপত্র কিনিবার সময় এত পাকা দরদস্তুর করিতেন ও চাকরদের হিসাব-পত্র এত বিচক্ষণভাবে লইতেন যে, তাঁহাকে কখনও কেহ ঠকাইতে পারে নাই। তিনি যেদিন শেষ পীড়ায় দুর্ব্বল হইয়া শয্যাগ্রহণ করিতে বাধ্য হন সেদিন পর্য্যন্ত তাঁহার হিসাবের খাতায় হিসাব লিখিয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার বিবাহের পর এই ১৮ বৎসর ৩মাসের তাঁহার নিজের হাতে লেখা অবিচ্ছিন্ন দৈনন্দিন হিসাব খাতাগুলিতে মুক্তাব মত পরিষ্কার অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

সরোজনলিনী প্রতি বৎসর নিজের হাতে কুলের চাট্‌নি, আমের চাট্‌নি, আমসত্ব ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেন। তিনি অতি সুস্বাদু সন্দেশ তৈয়ার করিতেন ও যাঁহারা তাঁহার হাতে প্রস্তুত করা সন্দেশ একবার খাইতেন তাঁহারা আরো খাইতে চাহিতেন। স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার দূর সম্পর্কে 'দাদা মহাশয়' ছিলেন। তিনি সরোজনলিনীকে বড় স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন ও আদর করিয়া 'দিদিমণি' বলিয়া ডাকিতেন। তিনি যখন দার্জ্জিলিংএ রোগ-শয্যায় শায়িত, তখন আমরা তাঁহাকে দেখিতে যাই ও তিনি সরোজনলিনীর হাতের সন্দেশ খাইতে

ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সরোজনলিনী পরদিনই তাঁহার জন্য সন্দেশ তৈয়ার করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

আমরা যখন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসি, তখন ভূপেনবাবু আমাদিগকে বিদায় দিতে Waterloo (ওয়াটারলু) ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। আমাদের তখন একটা খারাপ জেলায় বদ্‌লি হইবার কথা হওয়ায় সরোজনলিনীর মন একটু খারাপ ছিল। ভূপেনবাবু তার পরেই এক চিঠিতে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন,—"দিদিমণি, মন খারাপ করো না, আবাব শীঘ্রই সুদিন আসবে, আবার দখিন হাওয়া ছুটে আসবে।" ভূপেনবাবুর এই "আবার দখিন হাওয়া ছুটে আসবে" কথাটা তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছিল এবং প্রায়ই এই কথার উল্লেখ করিতেন।

নিজের ঘরকন্নাব কাজ ছাড়া তিনি আমারও সব কাজ করিয়া দিতেন; আমার কাপড়-চোপড় গুছানো ও তাহার হিসাব রাখা, এমন কি আমার ব্যাঙ্কেব টাকার হিসাব রাখা, ব্যাঙ্কে গিয়া আমার মাহিনার টাকা জমা দিয়া আসা এবং আমার বইগুলি পর্য্যন্ত গুছাইয়া রাখা তিনিই করিয়া দিতেন। বস্তুতঃ আফিসের কাজ ছাড়া আমাকে বাড়ীর ও সংসারের আর কিছুই দেখিতে হইত না। তিনি সবই করিতেন ও অতি সুন্দর করিয়া করিতেন।

কার্য্যোপলক্ষে বিবাহিত জীবনের এই ১৮ বৎসর ৩ মাসের মধ্যে আমাকে অন্যূন ২৫ বার স্থান ও গৃহ পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। তিনি প্রতিবার বাড়ীর সমস্ত আসবাব জিনিসপত্র বাসন ছবি ইত্যাদি নিজের হাতে প্যাক্ করিতেন ও খুলিতেন। একটিও ভাঙ্গিত না, এমন কি আমার বইগুলির প্যাকিং করা ও খোলার কাজও তিনিই করিতেন। পরিশ্রম

করিবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল; এমন কি তিনি পরিশ্রমে যেন বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন।

ছেলের খাবার দুধ তিনি প্রতিদিন গাই আপনার সাম্‌নে আনাইয়া গোয়ালার হাত ও দোয়াবার বাসন নিজের সাম্‌নে ধোয়াইবার পর দোয়াইতে দিতেন ও নিজের সাম্‌নে ফুটাইতেন। ছেলের শৈশবাবস্থায় তাহার খাওয়ার দুধ ইত্যাদি তিনি কখনো আয়াকে দিয়া তৈয়ার করাইতেন না, নিজেই তৈয়ার করিতেন ও খাওয়াইতেন। কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে ১৭ বৎসর কাল আমাদের মফঃস্বলে থাকা কালীন. আমাদের খাবার জলও যে রোজ ফুটানো হইত তাহা তিনি নিজে দেখিতেন। অফিসিয়াল্ জীবনের শত শত ভ্রমণ-জনিত বাধার মধ্য দিয়াও একদিনের জন্য এগুলির অন্যথা হইতে দেন নাই। শৈশবকালে আমাদের ছেলের হৃষ্টপুষ্ট ও সুস্থ সবল শরীর দেখিয়া বন্ধুবান্ধবগণ তাহাকে "প্রাইজ্ শিশু" অর্থাৎ শিশুপ্রদর্শনীতে পারিতোষিক লাভের যোগ্য শিশু বলিয়া অভিহিত করিতেন এবং শিশুপালনে সরোজনলিনীর কৃতিত্বের প্রশংসা করিতেন।

দুধের জন্য বাড়ীতে গাই রাখিতে সরোজনলিনী সর্ব্বদা ভালবাসিতেন এবং গাই ও বাছুরের পরিচর্য্যা ও খাবার-দাবার দেখার ও গোয়াল ঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পর্য্যবেক্ষণ নিজেই করিতেন।

ছেলের পড়ার তত্ত্বাবধানও তিনি সর্ব্বদা নিজে করিতেন ও শৈশবকালে তাহার ইংরেজীশিক্ষার ভার তিনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাকে কণ্ঠসঙ্গীত ও নানাবিধ যন্ত্রসঙ্গীত শিখাইবার ভারও নিজে লইয়াছিলেন।

ছেলের বা আমার অসুখ করিলে তিনি আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। রোগীর পরিচর্য্যায় সরোজ-



শিশু বীরেন্দ্র-সদয

(১০ মাস বয়সে)

নলিনীর অসাধারণ নিপুণতা ছিল। একটা উদাহরণ এখানে উল্লেখ করিব।

অল্পদিন আগে আমি একদিন মোটর চড়িয়া আফিসে যাইতেছিলাম; রাস্তায় একটা ষ্টিমরোলারের চিম্‌নির ধোঁয়ার কয়লা আমার চোখে পড়িল। চোখে যন্ত্রণা হওয়ায় আমি আফিসে যাইবার পথেই চক্ষুচিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ একটি বাঙ্গালী ডাক্তার বন্ধুর দোকানে যাই। তিনি প্রায় আধ ঘণ্টা কাল বৈদ্যুতিক আলোক ও নানাপ্রকার যন্ত্রের সাহায্যে চোখ দেখিয়া বলিলেন, "চোখে কিছু নেই; কয়লার গুড়ো নিশ্চয়ই বাহির হইয়া গিয়াছে।" আমার মনে হইতেছিল বাহির হয় নাই। তিনি কিন্তু তাহা কিছুতেই মানিলেন না। অগত্যা আমি আফিসে গিয়া কাজ কবিতে লাগিলাম। চোখেব যন্ত্রণা কিন্তু কমিল না; বাড়িতেই চলিল। কয়েক ঘণ্টা পরে বাড়ী আসিয়া আমি সরোজনলিনীকে সব কথা বলিলাম। তখন তিনি শেষ রোগ-শয্যায় শায়িত। চোখের যন্ত্রণার বিষয় শুনিয়া বলিলেন,—"দেখি তোমার চোখ্‌টা।" শুইয়া শুইয়া যেই দেখা অমনি বলিলেন—"এই তো কয়লার গুড়ো রয়েছে, আমি দেখতে পাচ্ছি।" এই বলিয়া রুমালেব এক কোণ দিয়া নিপুণভাবে বেশ বড় একটা কয়লার কণা বাহির করিয়া আমাকে দেখাইলেন! আমিও যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইলাম। আজকালকার ডাক্তার কবিরাজদের পুঁথিপড়া দক্ষতার এবং বাঙ্গালী রমণীর স্বভাবগত নিপুণতার ইহা একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

দেশীয় সহজ সরল মুষ্টিযোগ ইত্যাদি সবোজনলিনী বিশেষ করিয়া মা ও ঠাকুরমার নিকট হইতে শিখিয়াছিলেন। অসুখ-বিসুখে সেগুলি খুব কাজে লাগিত।

আমি যখন ১৯০৮ সালে বক্‌সারে সবডিভিসন্যাল অফিসার ছিলাম তখন রাত্রে খাবার পরও কাজ করিতাম। ইহাতে আমার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। ইহার পর হইতে সরোজনলিনী আমাকে কখনো রবিবারে অথবা রাত্রে খাবার পরে আফিসের কাজ করিতে দিতেন না। যদি রবিবারে বা রাত্রে খাবার পরে কাজ লইয়া বসিতাম তিনি তাহা হাত হইতে কাড়িয়া লইতেন। খাইতে খাইতে বই ইত্যাদি পড়িলে বদ্‌হজম্ হয় বলিয়া তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন যে, খাইবার সময়ে কেহ পড়িতে পাইবে না। এই নিয়ম কেহ ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিলে তিনি কাগজ বা বই হাত হইতে কাড়িয়া লইতেন।

——o——

আদর্শ ভারত-নারী

তাঁহার প্রেম ও সখ্য, পদমর্য্যাদার সমাজের জাতির বা দেশের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল না। ধনী নির্ধন ছোট বড় রাণী ভিখারী হিন্দু মুসলমান* বাঙ্গালী মারোয়াড়ী ইংরেজ ফরাসী আমেরিকান জাপানী নির্ব্বিশেষে তিনি সকলের সঙ্গে সমান-ভাবে সখ্য স্থাপন করিতেন ও সকলেই তাঁহার স্বভাবগুণে ও সখ্যভাবে মুগ্ধ হইত। হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালী মারোয়াড়ী নির্ব্বিশেষে তিনি সকল সমাজের লোকের পরিবারের অন্তঃপুরে আগ্রহের সহিত গিয়া মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় ও সখ্য স্থাপন করিতেন। অনেক মুসলমান মহিলা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মহিলা-সমিতিগুলির সভ্য ছিলেন। মুসলমান মেয়েদের সৌন্দর্য্যের ও স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা ও সৌজন্যের তিনি যার-পর-নাই প্রশংসা করিতেন। সব জাতির মধ্যেই তিনি অকৃত্রিম বন্ধু রাখিয়া গিয়াছেন। আমাদের একজন জাপানী বন্ধু তাঁহার শ্রাদ্ধের সময় কলিকাতায় ছিলেন; শ্রাদ্ধোপলক্ষে তিনি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার প্রেমের গ্রন্থিতে সরোজনলিনী বিশ্বমানবের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

আমরা জাপান হইতে যে জাপানী জাহাজে বিলাতে যাই, সেই জাহাজে জাপানের খ্যাতনামা প্রবীণ রাজপুরুষ মার্কুইস্ হায়াসি (Marquis Hayashi) লণ্ডনে জাপানের Ambassador (রাজ-

* শ্রীযুক্ত সৈয়দ হাসান ইমাম্ ও শ্রীযুক্ত স্যার আলি ইমাম তাঁহাকে যার-পর-নাই শ্রদ্ধা করিতেন এবং আদর ও শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাকে "রাণী" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

প্রতিনিধি) হইয়া বিলাত যাইতেছিলেন। তিনি সরোজনলিনীর সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন ও তাঁহাকে যার-পর-নাই শ্রদ্ধা করিতেন।

৪ বৎসর পূর্ব্বে আমরা যখন বিলাতে ছিলাম তখন সরোজনলিনী ও আমি প্রায়ই ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে দেখিতে তাঁহার হোটেলে যাইতাম। তিনি একদিন বলিলেন—"তোমবা মাঝে মাঝে আস, তাতে বড় সন্তুষ্ট হই, কেননা অনেক সময় আমার বড় একলা বোধ হয়; সময় কাটে না, আর সব সময় পড়তেও ভাল লাগে না।" সরোজনলিনী তখন তাঁহাকে সময় কাটাইতে সাহায্য কবিবাব জন্য Patience নামক তাস খেলা শিখাইয়া দিলেন ও Patience খেলা বিষয়ক একখানা বই ও একজোড়া তাস কিনিয়া তাঁহাকে উপহার দিলেন। ইহাব পরে ভূপেন বাবু অনেকবাব কৃতজ্ঞতাব সহিত সবোজনলিনীর এই সহৃদয়তার উল্লেখ করিয়াছেন। ভূপেন বাবুব মৃত্যুব পবে সবোজনলিনী আমাকে এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—"ভূপেন্দ্র বাবুব মাবা যাবার খবর শুনে আমার মনটা বড় খারাপ হয়েছে। তার স্ত্রী বেচারিব জন্য বড় কষ্ট হয়; কত মোটা কবে সিঁথিতে সিঁদুর পরতেন ও লালপেড়ে সাড়ি পরতেন, কিন্তু তবু স্বামীকে রাখতে পারলেন না। একটা মহৎলোক চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। সত্যি, জীবনটা বড় মজার!"

ইহার পব সরোজনলিনী একদিন ভূপেনবাবুর বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রীকে দেখিতে গিয়াছিলেন ও আমাকে লিখিয়াছিলেন—"দিদিমার সঙ্গে দেখা হলো। বেচারির অবস্থা দেখে আমার ত কান্না পেয়ে গেছলো। মাটিতে শুয়ে ছিলেন। প্রথমটা খুব জোবে কাঁদ্‌লেন, তার পর আমি গায়ে হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিতে উঠে বসে কিছু কথাবার্ত্তা বল্লেন। বিধবা হওয়ার মত কষ্ট মেয়ে মানুষের পক্ষে বোধ হয় আর কিছু নেই।"



সরোজনলিনী

(৩০ বৎসর বয়সে)

২৭ পৃঃ

সমন্বয় ও মিলনের সরোজনলিনীর আশ্চর্য্য শক্তি ছিল। সব দেশের সব জাতির যাহা কিছু মন্দ তাহা বর্জ্জন করিয়া যাহা কিছু ভাল তাহা তিনি অকাতরে গ্রহণ করিতেন। একদিকে তিনি ইউরোপীয় মেয়েদের মত বাইরের সব কর্ত্তব্য, অশ্বারোহণ, টেনিস ইত্যাদি ক্রীড়া, সকল লোকের সঙ্গে মেলামেশা ও সব বিষয়ে অক্লেশে বাক্যালাপ করিতেন, অন্যদিকে নিজের জীবন হিন্দু নারীর প্রাচীন আদর্শে গঠিত করিয়া গৌরব বোধ করিতেন। হিন্দু-সমাজের মধ্যে যে সব প্রথা সুন্দর ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা তিনি বর্জ্জন করেন নাই। বরং সেগুলিকে অতি যত্নের সহিত নিজের জীবনের সঙ্গে গ্রথিত করিয়া রাখিতেন।

আমাদের বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে আমি কলিকাতায় একজন বিশেষ উচ্চপদস্থ বিলাত ফেরত বন্ধুর বাড়ীতে আসিয়াছিলাম। "গায়ে হলুদের" দিন সরোজনলিনী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আমার আসিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিলেন। কিন্তু আমি যে বন্ধুর বাড়ীতে ছিলাম সেখানকার মহিলারা আমাকে "গায়ে হলুদে" যাইতে বারণ করিলেন ও বলিলেন—"ওসব ব্যাপারে যাবেন না, ওসব সেকেলে ব্যাপারে মেয়েরা আপনাকে যার-পর-নাই অপদস্থ করবে।" আমি গেলাম না। সরোজনলিনীর আর গায়ে হলুদ হইল না। ইহার জন্য তিনি পরে প্রায়ই আক্ষেপ করিতেন ও আমাকে দোষ দিতেন।

তিনি মেয়েদের কোন প্রকার ধূমপান করা অথবা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুযায়ী স্ত্রীপুরুষে একসঙ্গে নৃত্য মোটেই পছন্দ করিতেন না। অপরন্তু হিন্দু মহিলার প্রিয় শাঁখা, সিন্দুর ও নোয়া অতি আগ্রহের সহিত পরিতেন। তাঁহার শাঁখা পরা দেখিয়া ব্রাহ্ম ও খৃষ্টিয়ান সমাজের অনেকে বিস্মিত হইতেন, কিন্তু তিনি হাসিয়া বলিতেন "স্বামীর কল্যাণের

জন্য শাঁখা পরিতে হয়, আমাদের দেশের এই সুন্দর প্রাচীন প্রথাকে আমি বড় ভালবাসি।”

সরোজনলিনীর শাঁখা পরা দেখিয়া সন্তোষের রাণী এত প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি নিজের হাত হইতে শাঁখা দুটি খুলিয়া সরোজনলিনীর দুহাতে পরাইয়া দিয়াছিলেন। সন্তোষের রাণীর উপহাব এই শাঁখা দুটি ইহজীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সরোজনলিনীর হাতে পরা ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে টেনিস খেলা ইত্যাদি ব্যায়াম ক্রীড়া সত্বেও তাঁহার হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া যাইত না।

এই সম্পর্কে সরোজনলিনীর মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহাব ছেলেবেলায় তাঁহার ঠাকুরমা বলিতেন,—“সরোজের হাতগুলি বড় শান্ত; তার হাতে কোন জিনিস ভাঙ্গে না।” তিনি সাড়ী পবিয়াই টেনিস খেলিতেন; বলিতেন যে, সাড়ী বা সাড়ীর আঁচলের দ্বারা তাঁহার খেলার কোন বাধা জন্মায় না। স্ত্রীপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং অভিনন্দন ব্যাপারে করমদ্দন করায় তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেন এবং দেশীয় প্রথামত নমস্কার করিতেই ভালবাসিতেন। অনেক সম্ভ্রান্ত বন্ধু অনেক সময় তাঁহার সঙ্গে করমদ্দনের জন্য হাত বাডাইয়া দিয়া অপ্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি হস্তপ্রসারণ না করিয়া সহাস্যে নমস্কার করিতেন। আমি খাইবার পূর্ব্বে তিনি কখনও খাইতেন না, আমার হাজার দেরী হইলেও আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। ইহা লইয়া অনেক বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে সেকেলে বলিয়া ঠাট্টা করা সত্ত্বেও তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। এই সম্পর্কে একদিনের কথা আমার বিশেষ করিয়া মনে পড়ে। আমি তখন খুলনা জেলার কলেক্টার। আমরা কলেক্টরের সরকারী বাষ্পীয় জাহাজে (Steam Launch) করিয়া মফঃস্বলে গিয়াছিলাম। আমাদের সঙ্গে কলিকাতার একটি

বিশেষ সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা-বন্ধু ছিলেন। আমি জাহাজ ছাড়িয়া সকালে কাজে গিয়াছিলাম। ১১টার সময় ফিরিয়া আসিবার কথা ছিল, কিন্তু কাজে জড়িত হইয়া যাওয়ায় ফিরিতে প্রায় ৫টা বাজিয়া গেল। সরোজনলিনীকে তাঁহার মহিলা-বন্ধু খাইবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন, এবং তাঁহার এই সেকেলে ব্যবহারে যারপরনাই বিস্ময় ও বিদ্রূপ প্রকাশ কবিলেন; কিন্তু সরোজনলিনী সহাস্যে সব বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া আমাব জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া বহিলেন ও আমি ফিরিয়া আসিলে আমার সঙ্গে খাইলেন। আমাকে তিনি কখনো কোন কারণে তাঁহাব পা ছুঁইতে দিতেন না। পাশ্চাত্য প্রথানুযায়ী কখনো আমাকে আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেন না, সেই সেকেলে মিষ্টি "ওগো" সম্বোধন করিয়াই ডাকিতেন ও "উনি" বলিয়া উল্লেখ করিতেন। হিন্দু নারীর "শুচি বাই" তাঁহাতে পুরো মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। আমাকে বা আমার ছেলেকে হাত মুখ না ধোয়াইয়া কখনো খাইতে বসিতে দিতেন না; অথবা ফল ইত্যাদি না ধুইয়া খাবার টেবিলে রাখিতে দিতেন না। বাড়ীর প্রত্যেক মেঝে রোজ ধোয়াইতেন।

সরোজনলিনী পান খাইতে ভাল বাসিতেন। ডিনারে ইংরাজ বন্ধুরা নিমন্ত্রিত হইলেও আহারের পরে সকলকে পান দেখান হইত। অনেক ইংরাজ বন্ধু আমাদের বাড়ীতে ডিনারের পর পান খাইয়াছেন। যখন ইংরাজ বন্ধুদের বাড়ীতে আমরা ডিনার খাইতে নিমন্ত্রিত হইয়া যাইতাম, সরোজনলিনী রুমালের কোণায় কিছু সুপারি ও মশলা ইত্যাদি বাঁধিয়া লইয়া যাইতেন ও ডিনারের পরে তাহা খাইতেন।

রোজ স্নান করা সরোজনলিনীর একটা মজ্জাগত অভ্যাস ছিল। কোন দিন অসুখ-বিসুখের জন্য স্নান না করিতে পারিলে যার-পর-নাই

অপরিষ্কার বোধ করিতেন ও যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্নান না করিতে পারিতেন ততক্ষণ খুঁত্ খুঁত্ করিতে থাকিতেন। আমি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর সেখানে থাকাকালীন অভ্যাস-অনুযায়ী রোজ স্নান করিতে চাহিতাম না। তাঁহার প্রভাবে অল্পকাল মধ্যেই আবার রোজ স্নানের অভ্যাস করিতে হইয়াছিল।

দেশের পুরাতন হিন্দুপ্রথা অনুযায়ী বিজয়া দশমীর দিন পরিবারের মধ্যে একটা প্রেমের ভাব জাগাইয়া তুলিবার জন্য গুরুজনকে পা ছুঁইয়া প্রণাম করিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে তিনি ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিতেন।

তাঁহার বাপের বাড়ীতে পাশ্চাত্য প্রথার অনুকরণে বড় ভাইবোনদিগকে নাম ধরিয়া ডাকার প্রথা প্রচলিত ছিল। তাঁহার সনির্ব্বন্ধ চেষ্টায় সেই প্রথা উঠাইয়া বড় ভাইবোন্‌কে দেশীয় প্রথামত দাদা, মেজদা, মেজদি, সেজদা, সেজদি, ন'দা, ন'দি, রাঙ্গাদা, রাঙ্গাদি, নতুনদা, নতুনদি, ছোট্‌দা, ছোট্‌দি ইত্যাদি সম্বোধন প্রচলিত করাইয়াছিলেন। যখন তিনি শ্রীহট্ট জিলায় তাঁহার শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলেন তখন খালি পায়ে ঠিক হিন্দু বৌ'য়ের মত থাকিতেন। তাঁহার হিন্দু-নারীসুলভ সাদাসিদে ব্যবহার দেখিয়া সেদেশের সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

এই একবারকার সাক্ষাৎকারে ও পরিচয়ে আমার দেশীয় আত্মীয় কুটুম্বেরা তাঁহাকে ঘরের বৌয়ের মত আদর করিতে শিখিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার ননদরা আমাকে যত ভাল বাসিতেন তাঁহাকে তাহার অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিতেন।

হিন্দুনারীর ধর্ম্ম সরোজনলিনীর হাড়ে হাড়ে যেন গাঁথা ছিল। আমাকে প্রায়ই বলিতেন "এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার দুটি পায়ের নীচে মাথা রাখিয়া তোমাকে ও ছেলেকে সুখে রাখিয়া হাতে শাঁখা ও

সিন্দূরে ভরা মাথা নিয়া মরিতে পারি।” আমি এরকম কথায় তাঁহাকে খুব ভৎর্সনা করিতাম; কিন্তু তিনি এ বিষয়ে তাঁহার মত কখনও পরিবর্ত্তিত করিতেন না। এ রকম কথা বলিবার পরক্ষণেই বলিতেন—“আমি আগে যাব বটে, কিন্তু তোমার জন্যে গিয়ে অপেক্ষা করে থাক্‌ব।” মানবাত্মার অবিনশ্বরতায় ও পরলোকে পুনর্মিলনের বিশ্বাস তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা ছিল।

“তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই,
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথাও বিচ্ছেদ নাই!”

এই গানটি সরোজনলিনী প্রায়ই গাহিতে ভালবাসিতেন। সাবিত্রীর নাম ও চরিত্রের উপর তাঁহার বড় আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। তিনি অনেক সময় বলিতেন, “আমার যদি মেয়ে হ'ত তবে তাহার নাম 'সাবিত্রী' রাখ্‌তাম।”

মেয়েদের চরিত্রের নির্ম্মলতার উপর তিনি বড় বেশী গুরুত্ব স্থাপন করিতেন। তিনি বলিতেন “পুরুষদের কথা ছেড়ে দাও, মেয়েমানুষের চরিত্রই তাহাদের প্রধান অলঙ্কার, মেয়ে যদি সম্পূর্ণ সচ্চরিত্রা না হয়, পতিব্রতা না হয়, তবে তার শিক্ষা ধন মান সাজসজ্জা জাঁকজমক সবই বৃথা। সীতা-সাবিত্রীর দেশের মেয়ে আমরা। আমাদের দেশের মেয়েদের চরিত্র এমন হওয়া উচিত যেন অন্য দেশের মেয়েরা তার অনুকরণ করতে পারে।” আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিও কর্ম্মের প্রয়োজনে অথবা আতিথ্যের সৌজন্যে তিনি পুরুষদের সঙ্গে প্রয়োজনানুযায়ী অবাধে সুন্দরভাবে মেলা-মেশা করিতে পারিতেন, তথাপি আমি সঙ্গে না থাকিলে পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশাতে বরাবর কেমন একটা কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ বোধ করিতেন এবং নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে আমার অনুপস্থিতিতে অন্য পুরুষদের সঙ্গে

কোথাও যাইতে বা কথা বলিতে বাজি হইতেন না। ইহা লইয়া আমাব অনেক সময় তাঁহাকে ঠাট্টা করা সত্ত্বেও এই মধুব সলজ্জভাব তাঁহাব চবিত্রেব একটা প্রধান অলঙ্কাবস্বরূপ হইয়া ববাবব বর্ত্তমান ছিল।

তাঁহাব বহির্জীবন যেমন কর্ম্মস্রোতে ভবা ছিল, পাবিবাবিব জীবনও সেইরূপ কর্ত্তব্যে, কোমলতায়, মাধুর্য্যে ও শৃঙ্খলায় পূর্ণ ছিল। আব দুই জীবনই প্রেমে ও আনন্দে তন্ময় থাকিত। কি ঘবে কি বাহিবে তিনি ঝগড়া বিবাদ বা নিবানন্দকে দেখিতে পাবিতেন না। সর্ব্বদা মিলনেব মধ্যে ও আনন্দেব মধ্যে থাকিতে ভালবাসিতেন। কোন বকমেব নূতন খেলা আবিষ্কাব হইবামাত্রই তাহা আগ্রহেব সহিত শিখিয়া ফেলিতেন। সব বকমেব খেলাধূলাতে ববাবব বালিকাদেব মত আমোদ কবিতে ভাল বাসিতেন। তিনি যেন একটি মূর্ত্তিমতী আনন্দ ছিলেন।*

শ্রীযুক্তা লেডী বসু বলিয়াছেন,—"তিনি যখন যেখানেই যাইতেন যেন চাবিদিকে আনন্দ ছড়াইয়া দিতেন।"

আমাদের জাপান হইতে বিলাত যাওয়াব সময় জাহাজে একজন ইংবেজ বন্ধু Russian Patience (রুসীয় পেসেন্স্) নামক এক প্রকাব নূতন তাস খেলা জানিতেন দেখিয়া সবোজনলিনী তাঁহাব নিকট এই খেলা শিক্ষা করেন ও আমাকে শিখান, পরে দেশে ফিবিয়া আসিয়া এই নূতন খেলা অনেক ইংবাজ ও বাঙ্গালী বন্ধুদেব মধ্যে প্রচলিত করেন।

* প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত এস, আব, দাস মহাশয় সরোজনলিনীর পবলোক-গমনেব পর লিখিয়াছেন "আপনার স্ত্রীব মুখ হাসি ছাড়া কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।"

একদিকে যেমন বিদেশী নূতন খেলা তিনি আগ্রহের সহিত শিখিতেন, তেমনি অপর দিকে বালিকা-সুলভ কৌতুক-প্রিয়তার সহিত

"ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চাম চিক্‌ড়ি"

"আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে
ঢাল মির্‌গেল ঘুঙ্গুর বাজে"

ইত্যাদি ছড়া আবৃত্তি করিয়া দেশীয় খেলা করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। নিজের স্বভাব যেমন বালিকা-সুলভ সরলতা ও আনন্দে ভরা ছিল তেমনি বালক-বালিকাদের সহিত থাকিতে তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তাঁহার ভাইয়ের দুই বৎসর বয়স্কা শিশু কন্যাকে তিনি আদর করিয়া 'পরী' নাম দিয়াছিলেন ও তাহাকে এত ভাল বাসিতেন যে, তাঁহার শেষ রোগশয্যায় রোজ মাত্র এক বেলার বেশী তাহাকে দেখিতে পাইতেন না বলিয়া আক্ষেপ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন।

বিবাহ ইত্যাদি আনন্দ-উৎসবে আমোদ-আহ্লাদ করিতে সরোজনলিনী অদ্বিতীয়া ছিলেন। হিন্দুবিবাহে "স্ত্রী-আচার"গুলির আমোদ তিনি বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার তিনটী বোনের বিবাহ আমাদের বিবাহের পরে হয়। এই তিন বিবাহের প্রত্যেকটীর স্ত্রী-আচারের ব্যবস্থায় ও তাহার আমোদ-প্রমোদে তিনিই অগ্রণী হইয়াছিলেন। অনেকে বলিতেন, "স্ত্রী-আচারগুলো সেকেলে ব্যাপার; এতে কেবল সময় নষ্ট হয় মাত্র; এ সব করে দরকার কি?" সরোজনলিনী ইহার উত্তরে বলিতেন, "এ সব প্রাচীন সুন্দর আনন্দময় প্রথা বাদ দিলে জাতীয় ও সামাজিক জীবনে আনন্দ থাকিবে কি করিয়া?"

মেয়েদের অগ্রণী হইয়া নূতন বরকে নানা প্রকার মেয়েলি ঠাট্টা দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করিতে সরোজনলিনী সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। তাঁহার হুকুমে বাধ্য

হইয়া তাঁহার তিন বোনের বিলাত-ফেরত সুসভ্য বরদিগকে বিবাহের বরণের সময় সাহেবিয়ানা পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী সাজিতে হইয়াছিল এবং মেয়েদেব দ্বারা চন্দন-চিত্রিত কপালে স্মিতমুখে প্রবীণাদের

"কড়ি দিয়া কিন্‌লাম, দড়ি দিয়া বাঁধ্‌লাম,
হাতে দিলাম মাকু,
ভে করত বাপু!"

এই মন্ত্রের আবৃত্তি শুনিতে শুনিতে হাতে মাকু ধারণ করিয়া ভেড়া বনিতে হইয়াছিল। বরণের সময় শাঁখ বাজাইতে তিনি সকলের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার ভগ্নীপতিগণ তাহার তীব্র ঠাট্টার কশাঘাতের আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত থাকিতেন।

আমি যখন আরা জেলায় বক্সারে সবডিভিসনেল অফিসার ছিলাম, তখন সরোজনলিনী বেহারী অন্তঃপুর-মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু বেহারী মেয়েরা অপরিচিতা মেয়েদেরও সঙ্গে আলাপ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন। তখন ডুমরাওঁএর মহারাণী বাঁচিয়া ছিলেন। সরোজনলিনী তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার ইচ্ছা জানাইয়া পাঠাইলেন। মহারাণী বিপদে পড়িলেন। তিনি কখন অপরিচিতা মহিলার সমক্ষে বাহির হন নাই বা আলাপ করেন নাই; অথচ ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রীর অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলে চলে না। অগত্যা বন্দোবস্ত হইল, মহারাণী পর্দ্দার আড়ালে থাকিবেন; সরোজনলিনী পরদার বাহির হইতে তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবেন। এই প্রকারে মহারাণীর সঙ্গে সরোজনলিনীর মাঝে পরদা রাখিয়া বাক্যালাপ হইল। ইহার অল্পদিন পরেই মহারাণী কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হইয়া পড়িলেন এবং একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার কথা হইল। মহারাণীর পোষ্যপুত্র গ্রহণ উপলক্ষে আমার ও সরোজনলিনীর উভয়েরই

নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। আমরা পরদার বাহিরে পুরোহিত ও অন্যান্য অভ্যাগত-দিগের সঙ্গে বসিয়াছিলাম। পরদার ভিতর হইতে একজন রমণী পুরোহিতের কথার উত্তর দিতেছিলেন ও মন্ত্র আবৃত্তি করিতেছিলেন। আমাদিগকে বলা হইল, মহারাণীই এই সব কথা বলিতেছেন। সরোজনলিনী মহারাণীর সঙ্গে একবার পরদার বাহির হইতে আলাপ করিয়াছিলেন। তাঁহারও মনে হইল গলার স্বরটা যেন মহারাণীরই মত।

মহারাণীর মৃত্যুর পর এই পোষ্যপুত্র গ্রহণ নিয়া তুমুল মোকদ্দমা হয়। এই মোকদ্দমার এক পক্ষ ছিলেন সরকারের কোর্ট অব ওয়ার্ড্‌স্‌; আর এক পক্ষ ছিলেন শ্রীযুক্ত কেশো প্রসাদ সিংহ যিনি এখন ডুমরাও এর মহারাজা। সরকারের পক্ষে শ্রীযুক্ত স্যার আলি ইমাম ও স্যার রিচার্ড গার্থ ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন; আর কেশো প্রসাদ সিংহের পক্ষে ব্যারিষ্টার ছিলেন স্বয়ং স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ।*

সব-জজের আদালতে মোকদ্দমা হইতেছিল। আমরা তখন পূর্ণিয়া জেলার কিশনগঞ্জ মহকুমায়। সেখান হইতে আমার ও সরোজনলিনার উভয়েরই সরকারের পক্ষে সাক্ষীরূপে আসিবার জন্য শমন হইল। আমরা আরায় আসিয়া সারকিট-বাংলায় ছিলাম। আদালতে আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের জেরার মর্ম্ম এই ছিল যে, পোষ্যপুত্র গ্রহণের সময় মহারাণী বাস্তবিক জীবিত ছিলেন না; তার আগেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল; আর একজন স্ত্রীলোক পরদার ভিতর হইতে মহারাণীর গলার স্বরের অনুকরণ করিয়া কথা বলিতেছিলেন। চিত্তরঞ্জন অন্যান্য সরকার পক্ষীয় সাক্ষীদের ন্যায় আমার প্রতি তাঁহার তীব্র জেরা করিবার শক্তি প্রয়োগ করিলেন। সেই জেরা উপলক্ষে তাঁহাতে আমাতে এবং

* চিত্তরঞ্জন তখনও 'দেশবন্ধু' আখ্যা লাভ করেন নাই।

উভয় পক্ষের ব্যারিষ্টারদের মধ্যে রীতিমত বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া গেল। পরদিন সরোজনলিনীর সাক্ষ্য গ্রহণের দিন পড়িল। আমরা ভাবিলাম সরোজনলিনীকে আদালতে যাইতে হইবে এবং চিত্তরঞ্জন তাঁহাকেও তীব্র জেরা দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে সরোজনলিনীর সাক্ষ্য সারকিট্-বাংলাতেই লওয়া হইবে। সবজজ বাবু, স্যার আলি ইমাম, স্যার রিচার্ড গার্থ ও চিত্তরঞ্জন সারকিট্ বাংলায় আসিলেন। প্রথমতঃ স্যার আলি ইমাম ও স্যার রিচার্ড গার্থ সরোজনলিনীকে সরকার পক্ষ হইতে প্রশ্ন করিলেন; তার পরে চিত্তরঞ্জনের জেরা করিবার পালা আসিল। আমাদের ভয় কিন্তু অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। চিত্তরঞ্জন সরোজনলিনীকে যার-পর-নাই সৌজন্যের সহিত কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন, এবং সরোজনলিনীর সহজ ও সরল উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আর কূট জেরা দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন না।

বিবাহের তিন বৎসর পরে আমি পূর্ণিয়া জেলার কিশণগঞ্জে সব-ডিভিসনাল্ অফিসার হইয়া গিয়াছিলাম। সেখানকার দুই প্রতাপশালী মুসলমান জমিদারদের মধ্যে পুরুষানুক্রমিক ভীষণ বিবাদ ও শত্রুতা ছিল ও তাঁহাদের মধ্যে প্রায়ই দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইত। আমি এই দুই শত্রুর মধ্যে বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। সরোজনলিনী তাঁহাদের উভয়ের অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহাদের অন্তঃপুরের মহিলাদের উপর তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিয়া এই পুরুষানুক্রমিক বিবাদ মীমাংসার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার সহায়তা ছাড়া এই ভীষণ শত্রুতার নির্ব্বাণ অসম্ভব হইত।

পারিবারিক বা সামাজিক সর্ব্বপ্রকার আমোদ-আহ্লাদে সরোজনলিনী

সকলের অগ্রণী হইতেন ও নিমন্ত্রণ ইত্যাদিতে নিজহাতে পরিবেশন করিতে ভালবাসিতেন ; ইহাতে তাঁহার বিশেষ পটুতাও ছিল। তাঁহার শেষ পীড়ার সূত্রপাত হইবার পরেও অসুখ শরীর লইয়া তিনি পিতার জন্মদিনের ভোজে কোমর বাধিয়া অক্লান্তভাবে পরিবেশন করিয়াছিলেন।

সরোজনলিনী পারিবারিক জীবন ও সামাজিক কর্ম্মজীবনের অত্যাশ্চর্য্য সমন্বয় করিতে পারিতেন ; কখনো একটিকে অন্যটির বাধা হইতে দিতেন না। আমি তাঁহাকে অনেকবার বলিয়াছি,—"তোমার এত সামাজিক কাজ, তাহা করিবার সময় করিয়া উঠিতে পার না ; কুটনো কুটা, খাবার তৈরি করা ইত্যাদি চাকরদের হাতে দিলেই ত আরো অনেকটা সময় পেতে পার।" সরোজনলিনী তাহার উত্তরে বলিতেন :—"আমি যদি ঘরের কর্ত্তব্য অবহেলা করি, তবে সামাজিক কর্ত্তব্য করিবার অধিকার লাভ হবে না।"

তাঁহার দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের তালিকা হইতে তাঁহার কাজের মাত্রা ও প্রণালীর কিছু আভাস পাওয়া যাইবে।

দৈনিক কর্ত্তব্যের তালিকা

প্রাতঃকালে জাগিয়াই তিনি ঈশ্বরের কাছে অল্পক্ষণ প্রার্থনা করিতেন। তা'র পরে বাগানে যাইতেন। ফুল ও সবজির বাগান করার তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য সখ্ ছিল। নিজের হাতে ফুল ও সবজির গাছ লাগাইতেন ও মাটি খুঁড়িয়া দিতেন। মালিদের অপেক্ষা তিনি বাগানের কাজ ভাল জানিতেন। তাঁহার বাগানের সবজি প্রায়ই প্রদর্শনীতে পুরস্কার পাইত। তিনি রোজ নিজের হাতে শিম্, কড়াইসুঁটি ইত্যাদি গাছ হইতে পাড়িয়া আনিতেন ও আমাকে তাঁহার সঙ্গে গিয়া পাড়িতে উৎসাহিত করিতেন। তিনি যখন যেখানে গিয়াছেন তাঁহার ফুলের বাগান দেখিয়া বাঙ্গালী ইংরেজ মাত্রেই প্রশংসা করিয়াছেন। বাগান দেখার পর আমার সঙ্গে ভ্রমণে যাইতেন। ফিরিয়া আসার পর সোজা "গুদামে" (ভাণ্ডার-ঘরে) গিয়া পাচককে খাবার জিনিস বাহির করিয়া দেওয়া, এক ঘণ্টা কাল নিজের হাতে কুট্‌নো কুটা, খাবার ব্যঞ্জন ও মিষ্টি নিজ হাতে তৈরী করা, রান্নাঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পর্য্যবেক্ষণ করা, ঘর-সংসার পরিষ্কার করা ও গোছানো, ধোপার যোগান ইত্যাদি লওয়া ও দেওয়া, তারপর আমাকে ও ছেলেকে খাওয়ানো এবং আমাদের সঙ্গে খাওয়া, ইহাই ছিল প্রাতঃকালের কর্ত্তব্য।

আহারের পর আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে ও মহিলা-অনুষ্ঠান বিষয়ক চিঠি পত্রাদি লেখা, গৃহশিল্প-কার্য্য করা, কাপড়-চোপড় সেলাই করা, নিজের হাতে পান সাজিয়া রাখা, খবরের কাগজ ও মাসিক পত্রাদি

পড়া, নূতন সঙ্গীত অভ্যাস করা, কখনো কখনো আমার সঙ্গে বাহির হইয়া আমাকে আফিসে নামাইয়া দিয়া বাজার করিতে যাওয়া ও আমাকে কখনো কখনো আফিস হইতে ফেরত আনিতে যাওয়া, এই গুলি ছিল মধ্যাহ্নের কর্ত্তব্য। বিকেল বেলা আমাদিগকে ও বন্ধুবান্ধবদিগকে চা খাওয়ানো, আমার সঙ্গে টেনিস ইত্যাদি খেলা অথবা মহিলা-অনুষ্ঠান সম্পর্কীয় কোন মিটিং'এ যাওয়া, কিম্বা অন্তঃপুর-মহিলাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহাদের বাড়ীতে যাওয়া, এইগুলি ছিল অপরাহ্ণের কর্ত্তব্য। সন্ধ্যাবেলাও তিনি আলস্যে কাটাইতেন না। নিজের পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন অথবা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আমোদ-প্রমোদ করা, রাত্রে খাবার পর পাচকের ও অন্যান্য চাকরের নিকট হইতে হিসাব লওয়া ও তারপর আমার চিত্ত-বিনোদনের জন্য সাধারণ সঙ্গীত ও পরে ধর্ম্মসঙ্গীত গান করা ছিল সন্ধ্যার কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের কাছে অল্পক্ষণ প্রার্থনা না করিয়া তিনি শয়ন করিতেন না। এত কর্ত্তব্যের মধ্যেই আবার সময় করিয়া নূতন নূতন বিষয় পড়িয়া ও শিখিয়া লইতেন।

এ সমস্ত কার্য্য তিনি এত নিপুণতার ও পূর্ণতার সহিত করিতেন যে কোন কাজে কখনও কেহ ক্রটী ধরিতে পারিত না। যে কাজে হাত দিতেন তাহাতে সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। শ্রীযুক্তা লেডী বসু লিখিয়াছেন—

"তিনি যে কি করিয়া এত কাজ করিয়া উঠিতে পারিতেন, তাহা ভাবিয়া আমি আশ্চর্য্য হইতাম। বোধ হয়, তিনি নিজের জীবনকে একটি সুন্দর শৃঙ্খলার মধ্যে আনিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এত কাজ এত সুন্দরভাবে করিয়া উঠিতে পারিতেন। লোকাভাবে দেশে কত কাজ পড়িয়া আছে; কাজের জন্য লোক খুঁজিয়া পাই না, এমন সময় সরোজনলিনী নিজ হইতে

আসিয়া নারীশিক্ষা-সমিতির কাজে যোগ দিলেন এবং বাণী-ভবনের সম্পাদিকার গুরুভার গ্রহণ করিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করিলেন। যখনই তাহাকে ডাকিয়াছি তখনই তিনি আসিয়াছেন এবং উৎসাহের সহিত কার্য্য সুচারুরূপে করিবার আয়োজন করিয়াছেন। তাহার অবর্ত্তমানে বাণী-ভবনের এবং নারীজাতির উন্নতি সম্বন্ধীয় সকল অনুষ্ঠানের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা আমি প্রকাশ করিতে অক্ষম।"

চরিত্রের বিশিষ্টতা

মঙ্গলময় ঈশ্বরের উপর সরোজনলিনীর অটুট বিশ্বাস ছিল এবং প্রায়ই বলিতেন "ভগবান বড় দয়াময়; তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন"। ঈশ্বরের অস্তিত্ব অথবা মঙ্গলময় উদ্দেশ্য বিষয়ে কেহ বিদ্রূপ করিলে তিনি মনে বড় ব্যথা পাইতেন। ঈশ্বরের করুণায় বিশ্বাস রাখিয়া তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অদম্য উৎসাহ ও অবিচলিত চেষ্টা দেখিয়া আমি অনেক সময় অবাক্ হইয়াছি। বাঁকুড়া ও বীরভূমের মত পশ্চাৎপদ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রাণহীন জায়গায় আমি যে সকল মহিলা-অনুষ্ঠান অসম্ভব বলিয়া তাঁহাকে বার বার বিরত হইতে বলিতাম, তিনি নিজের আন্তরিক প্রেম ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বলে অবিচলিত চেষ্টায় সেই গুলিকেই সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন।

তাঁহার অভ্যাস ও জীবনের প্রণালীগুলি বড় সাদাসিদে ছিল। তিনি সকল প্রকারের মিথ্যা চাকচিক্য, আড়ম্বর ও বিলাসিতার বিরোধী ছিলেন। জাঁকজমক করিতে অথবা দামী অলঙ্কার পরিতে তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। বলিতেন—"লোকে উচ্চপদ বা ধনলাভ করে কেন জাঁক করে তা আমি বুঝি না। উচ্চপদ বা ধনলাভের একমাত্র সার্থকতা হচ্ছে সাধারণের সেবার সুযোগ। তা না করে যারা জাঁক-জমক বা বিলাসিতা করে তাদের উচ্চপদ বা ধনলাভ বিড়ম্বনা মাত্র।"

দামী অলঙ্কারের প্রতি তাঁহার মন কখনো আকৃষ্ট হইত না। তিনি কেবল নানাবিধ সুন্দর রংএর সাড়ীতে আপনাকে বিভূষিত

করিতে ভালবাসিতেন। কিন্তু সাড়ীগুলি কখনও বেশী দামের হইত না; আর কাপড়গুলি এত যত্নে রাখিতেন যে ১৮।১৯ বৎসরের রেশমের সাড়ী এখনও নূতন অবস্থায় রহিয়াছে। আমাদের ছেলের শৈশবের কাপড়গুলি সযত্নে রাখিয়া দিয়াছেন, যেন নাতি-নাত্‌নিরাও পরিতে পারে। গহনাগুলি এত সাবধানে পরিতেন ও রাখিতেন যে, বিবাহিত জীবনের ১৮ বৎসর ৩ মাসের মধ্যে একটি গহনাও হারাইয়া যায় নাই। ইংরাজ-বাঙ্গালী নির্ব্বিশেষে সকল বন্ধুই তাঁহার কাপড় পরিবার সুরুচির প্রশংসা করিতেন এবং অনেকেই তাঁহার কাপড় ও জামা ইত্যাদির অনুকরণ করিবার জন্য নমুনা লইয়া যাইতেন।

বিবাহের পরে দুই-এক বৎসর কাল আমার আর্থিক অবস্থা বড় অসচ্ছল ছিল। একদিকে ঘরকন্নার ও অতিথি-সৎকার ইত্যাদির খরচ সংকুলান, তাহার উপর আবার আমার পারিবারিক ঋণ শোধ ও আমার বিলাত যাইবার জন্য যে ঋণ করিতে হইয়াছিল তাহার শোধ করার জন্য মাসিক খরচ, এই সকল কারণে মাহিনার টাকা দ্বারা সংসার চালানো অসম্ভব হইয়া পড়িতেছিল। এই অর্থ-সঙ্কটে সরোজনলিনী নিজে যে সব দামী অলঙ্কার বিবাহের সময় পিতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন তাহা অম্লানবদনে বাহির করিয়া আমার হাতে বিক্রয়ের জন্য তুলিয়া দিয়াছিলেন ও আমরা উভয়ে কলিকাতায় আসিয়া তারাচাঁদ পরশুরাম প্রভৃতির দোকানে গহনাগুলি বিক্রয়ের জন্য মূল্যের যাচাই করিয়া বেড়াইয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা কেহই বেশী দাম দিতে রাজী হয় নাই—তখন গহনার দর কমিয়া গিয়াছিল। তাই সরোজনলিনীর এক কাকার নিকট সেগুলি বিক্রয়ের জন্য রাখিয়া গিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে সৌভাগ্যক্রমে আমার বেতন বৃদ্ধি হওয়ায় আর গহনা বিক্রয় করিতে হয় নাই। তিনি কিন্তু অম্লান বদনে গহনাগুলি

বিক্রয় করিতে নিজেই প্রস্তাব করিয়াছিলেন ও তাহাতে বিন্দুমাত্রও আক্ষেপ প্রকাশ করেন নাই। তিনি বরাবর বলিতেন, "গহনার উপর আমার মোটেই লোভ হয় না।"

অর্থের উপরও সরোজনলিনীর লোভ দেখি নাই। লক্ষপতি ও ক্রোড়-পতিদের কথা শুনিয়া বা তাহাদের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও লোভ বা ঈর্ষা হইত না। আমি মাঝে মাঝে ডারবি সুইপের (Derby Sweep) লটারির টিকিট কিনিতাম ও বলিতাম এবার যদি জিতি তবে লক্ষপতি হইয়া যাইব। তিনি কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ করিতেন না। বরং বলিতেন, "এত বেশী টাকা আমি চাই না; স্বাভাবিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এবং কর্ত্তব্যপালনের জন্য যেটুকু দরকার তার বেশী টাকার কি প্রয়োজন? যাদের অগাধ টাকা তাদের অনেক দুঃখকষ্ট ও অশান্তি হয়; বেশী টাকা হাতে এলে সুখশান্তি ও জীবনের স্বাভাবিক সহজ সরল প্রণালী বজায় রাখা যায় না।"

যাহাতে তিনি স্বেচ্ছানুসারে নিজের সাড়ী, অলঙ্কার ইত্যাদি খরিদ করিতে পারেন ও অন্যান্য খরচ করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে আমি তাঁহার নামে ব্যাঙ্কে একটা পৃথক হিসাব খুলিয়া দিয়াছিলাম; তাঁহার কাছে পৃথক চেক বহি ছিল, তিনি কিন্তু তাহা হইতে ঘরকন্নার জন্য আবশ্যক খরচ এবং আমার ও পুত্রের জন্মদিন উৎসব উপলক্ষে আমাদিগকে উপহার প্রদানের খরচ ছাড়া আর কোন জিনিষের জন্য খরচ করিতেন না। সাড়ী, অলঙ্কার ইত্যাদি আমি কিনিয়া না দিলে তিনি নিজে কখনও কিনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন না; বেশী দামের সাড়ী বা অলঙ্কার কিনিয়া দিলে তাহা পরিতে স্বীকৃত হইতেন না। তাঁহাকে নূতন সাড়ী ও গহনা পরাইতে অনেক সময় যার-পর-নাই পীড়াপীড়ি করিতে হইয়াছে। ব্যাঙ্কে নিজের

টাকা থাকা সত্ত্বেও তিনি আমার অনুমতি না লইয়া নিজের জন্য কোন জিনিষ কিনিতেন না।

সকল প্রকার কৃত্রিমতাকে তিনি ঘৃণা করিতেন, তাঁহাকে মুখে বা হাতে কখনও রঙ্ বা পাউডার ইত্যাদি লাগাইতে দেখি নাই। তিনি নৈতিক অধঃপতনকেও প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতেন। যে সরোজ-নলিনী জঙ্গলে বাঘ দেখিয়া ও আমার সঙ্গে আহত বাঘের অনুসরণ করিতে বিন্দুমাত্রও ভীত বা বিচলিত হন্ নাই, সেই সরোজনলিনীই মাতালকে ৫০ হাত দূরে দেখিলে ছুটিয়া দূরে পলাইয়া যাইতেন এবং বলিতেন "মাতালকে আমার বড় ভয় ও ঘৃণা করে।" ছেলেকে প্রায়ই বলিতেন, "বাবা, তুমি লেখাপড়ায় উচ্চস্থান অধিকার করিতে না পার তাতে আমার আক্ষেপ নেই; কিন্তু আমি চাই যে তুমি চরিত্রবান হও।"

যেরূপ গৃহে এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সেইরূপ সভাসমিতিতেও জাঁকজমক বিহীন পরিচ্ছদ ব্যবহারে সরোজনলিনী অভ্যস্ত ছিলেন। গত বৎসর কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে কলিকাতার একটী প্রসিদ্ধ বালিকা-বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণী সভায় তাঁহাকে পুরস্কার বিতরণ করিতে আমন্ত্রণ করা হয়। কলিকাতার সকল সম্প্রদায়ের লোকে জনাকীর্ণ সেই মহতী সভায় তিনি সাদাসিদে সূতার সাড়ী ও নাগরা জুতা পরিয়া পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে সেখানে উপস্থিত অনেক গণ্যমান্য বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে গঞ্জনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।

ফলতঃ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মহিলাচরিত্রের পরাকাষ্ঠার, কোমলতা ও দৃঢ়তার, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ও কর্ম্মপ্রিয়তার, মাধুর্য্য ও কর্ম্মক্ষমতার, নির্ভীকতা ও লজ্জাশীলতার, শারীরিক ব্যায়ামপ্রিয়তা ও নম্রতার, কৌতুকপ্রিয়তা



মাতা-পুত্র



বীরেন্দ্র-সদয়
(৬ বৎসর বয়সে)

৪৪ পৃঃ

ও পবিত্রতার, আদর্শ গৃহিণী ও আদর্শ সমাজ-সেবিকার, গৃহ-কর্ম্ম-কুশলতা ও সঙ্গীত এবং শিল্পকর্ম্ম-প্রিয়তার, সুরুচির সহিত অনাড়ম্বতার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাট্যের সহিত মিতব্যয়িতার, দেশহিতৈষিতার সহিত কুসংস্কার-বর্জন প্রিয়তার, রক্ষণশীলতার সহিত সমাজ সংস্কার-প্রিয়তার, সমাজে সকলের সঙ্গে সহাস্যে যথোচিত মেলামেশার সহিত চরিত্রের নিখুঁত নির্ম্মলতার, একাধারে সমাবেশ ও সমন্বয় তাঁহাতে ছিল। *

দেশপূজ্য আচার্য্য আমার শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত স্যার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সরোজনলিনীকে ভাল করিয়াই জানিতেন এবং যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। সরোজনলিনীর পরলোকগমনের পর তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন—"স্বামীর সহচারিণী, কর্ত্তব্যপরায়ণা, কর্ম্মপ্রাণ এবং লোকসেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে ব্যগ্র এরূপ অল্প মহিলাকেই দেখিয়াছি। ইঁহার অবর্ত্তমানে দেশের বিশেষ ক্ষতি হইল। তাঁহার দৃষ্টান্ত যেন সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত হয়।"

সরোজনলিনী মদ্য-পানের সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিলেন এবং আমি মদ স্পর্শ করি না বলিয়া যার-পর-নাই আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। চুরুট বা তামাকের গন্ধও তাঁহার ভাল লাগিত না। আমি কেম্ব্রিজে গিয়া অল্প চুরুট খাওয়া অভ্যাস করিয়াছিলাম। বিবাহের পর তিনি ইহার পক্ষপাতী নহেন বুঝিয়া চুরুট খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। তিনি কিন্তু বলিতেন,—"তামাক খেলে যদি তোমার মন ভাল থাকে অথবা তোমার পুরুষ বন্ধুদের সমাজে মিশিবার পক্ষে সহায়তা হয়, তবে তোমার তামাক খাওয়াতে

---

* শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় বলিয়াছেন :—"আজকালকার [illegible] মেয়েদের বিসদৃশ চালচলন দেখিয়া নব্যশিক্ষার উপর যখন সন্দিহান [illegible] [illegible]র জীবনের সুন্দর আদর্শের কথা মনে করিয়া আনন্দ পাইতাম।"

আমার আপত্তি নাই।” তাই বন্ধুরা পীড়াপীড়ি করিলে আমি মাঝে মাঝে দু-একটা চুরুট খাইতাম ; তাহাতে তিনি কোন অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন না। বরং মাঝে মাঝে দু-একটা চুরুট খাওয়া সত্ত্বেও আমাব চুরুট খাওয়ার নেশা নাই বলিয়া প্রশংসা করিতেন।

বিবাহের পর প্রথম কয়েক বৎসব ধরিয়া আমাদেব উভয়েব পবস্পরের চরিত্রের ও মনেব জোরেব একটা অলক্ষ্য বোঝা-পড়া ও শক্তিব পরীক্ষা হইয়াছিল। আমি তখন বিলাত হইতে সদ্য-প্রত্যাগত সিভিলিয়ান। নবীন সিভিলিয়ান-সুলভ সাহেবিয়ানার ঝাঁজটা আমাতে তখন পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। অল্প বয়সে বিদেশ-প্রবাসজনিত চরিত্রের চঞ্চলতাও জন্মিয়াছিল। আবাব চারিদিক হইতে অপ্রত্যাশিত সেলাম পাওয়ায় একটা আত্ম-প্রাধান্যের ভাব স্বতঃই আসিয়া আমাব চরিত্রের উপর পড়িতেছিল। তিনি কিন্তু তখন ভারত-রমণীব সহজ সরল স্বাভাবিকতা ও নম্রতায় পরিপূর্ণ ছিলেন। প্রকাশ্যে আমাব আচাবব্যবহাবেব বিরুদ্ধাচবণ বা প্রতিবাদ কবিতেন না ; বরং তাঁহাকে যে ভাবে চলিতে বলিতাম আমাব মনোরঞ্জনার্থে সেই ভাবে চলিবারই চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাহারই মধ্যে আমাব চরিত্রকে তিনি ধীরে ধীরে আপনার চরিত্রের স্থিরতা, দৃঢ়তা, কোমলতা ও নম্রতার প্রভাবে অলক্ষিত ভাবে বদলাইয়া আনিয়াছিলেন।

আমার খাতিরে পড়িয়া বাংলা কথা বর্জন করিয়া কিছুকাল কেবল ইংরাজী ভাষাতেই আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেন, পাশ্চাত্য ধরণে উঁচু করিয়া কেশ-বিন্যাসও আমার অনুরোধে করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন ; এমন কি, আমার অনুরোধে একজন নৃত্য-শিক্ষয়িত্রীর নিকট পাশ্চাত্য [illegible] করিতেও শিখিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি আমাকে [illegible] এগুলির মধ্যে কোনটাই এদেশের পক্ষে স্বাভাবিক বা

উপযোগী নয়। শেষটা তাঁহার প্রভাবেরই জয় হইয়াছিল; আমাকে তিনি আবার বাঙ্গালী করিয়াই তুলিয়াছিলেন। তাঁহার উদার গম্ভীর রক্ষণশীলতার নিকটে আমার উচ্ছৃঙ্খল পরিবর্ত্তনশীলতাকে এই সকল বিষয়ে পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

যাহারা বাঙ্গালী রমণীর চরিত্রের স্বভাবগত আধ্যাত্মিক বল ও দৃঢ়তার উপর বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের নিকটে পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তটি বিশেষ করিয়া উপস্থিত করিতে চাই।

যে সকল ক্ষেত্রে মানসিক জ্ঞান ও যুক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হইত সে সকল বিষয়ে সরোজনলিনী আগ্রহের সহিত প্রিয় শিষ্যার মত আমার কাছে শিক্ষা ও উপদেশ লইতেন, কিন্তু চরিত্রগত যাবতীয় ব্যাপারে আমি তাঁহার কাছেই শিক্ষা লাভ করিয়াছি।

আমি কার্য্যোপলক্ষে যখন যে জেলায় গিয়াছি সর্ব্বত্রই আমার অফিসিয়াল প্রতাপের প্রভাব অপেক্ষা তাঁহার চরিত্রের গভীর প্রেম ও সৌহার্দ্যের সঞ্জীবনী ও মিলন-সংগঠনী প্রভাব তথাকার সকলেই অনেক বেশী করিয়া উপলব্ধি করিতেন।

সরোজনলিনীর চরিত্রের এই অসাধারণ সততা, দৃঢ়তা ও স্বাভাবিকতার ভিত্তি সম্বন্ধে আমি অনেকবার ভাবিয়াছি এবং যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয়, ঈশ্বরে একটা স্বাভাবিক প্রবল বিশ্বাস, একটা গভীর অথচ সহজ ধর্ম্মপ্রাণতা ও আধ্যাত্মিকতা, মনুষ্যজীবনের পবিত্রতা-সম্বন্ধে অটুট ধারণা এবং পরলোকে বিশ্বাস প্রভৃতি সদ্‌গুণের উপর তাঁহার চরিত্রের ভিত্তি স্থাপিত ছিল বলিয়াই তিনি এত সহজ, সুন্দর, [illegible] অথচ এত দৃঢ় হইতে পারিয়াছিলেন। ঐহিক জীবনকে তিনি [illegible] জীবনের একটা ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র বলিয়া বিশ্বাস করি[illegible]

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্ম ও নীতির সহিত সংস্রব-বিবর্জ্জিত" জড়বাদিতা-মূলক শিক্ষা এবং হারবার্ট স্পেনসার, ডারউইন প্রভৃতি পণ্ডিতের নাস্তিকতা-মূলক গবেষণাপূর্ণ সাহিত্যাদির নিরন্তর চর্চ্চা আমার বাল্য জীবনের ধর্ম্মপ্রাণতার মূলোচ্ছেদ করিতে বসিয়াছিল। সরোজনলিনীর চরিত্র কিন্তু ভারত-নারীর স্বাভাবিক প্রগাঢ় ধর্ম্মপ্রাণতায় ও ঈশ্বরে একান্ত বিশ্বাসে কাণায় কাণায় ভরা ছিল। তাঁহার চরিত্রের নির্ম্মল পবিত্র প্রভাব ও আদর্শ আমার জীবনে নাস্তিকতার স্রোতকে রোধ করিয়া পুনরায় ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভরতার দিকে চালনা করিয়াছিল।

আমার ও তাঁহার জীবনের মধ্যে একটী বিশেষ পার্থক্য এই ছিল যে, আমার জীবনের প্রধান নির্ভর ছিল যুক্তির উপর ; তাঁহার জীবনের প্রধান নির্ভর ছিল প্রেমের উপর। জীবনের যাবতীয় সমস্যার মীমাংসা করিবার চেষ্টা আমি করিতাম যুক্তির দ্বারা, তিনি করিতেন প্রেমের দ্বারা। ফলে এই দেখিতাম যে, আমার যুক্তি-তর্কের টানে যে সকল সমস্যার জটিল গ্রন্থিগুলি বিশ্লেষিত না হইয়া আরো জটিলতর হইয়া উঠিত, তাঁহার হৃদয়ের সুকোমল প্রেমের পুলক-স্পর্শে সেগুলি যেন আপনা হইতেই সুস্পষ্ট ও সহজ হইয়া খুলিয়া যাইত। যুক্তি-তর্কের ও বচসার কুজ্‌ঝটিকায় যেখানে আমি পথ খুঁজিয়া পাইতাম না, সেখানে তাঁহার অন্তরের প্রেমের আলোকের সাহায্যে তিনি অক্লেশে পথ বাহির করিতেন। তাঁহার নিকট হইতে আমি এই শিখিয়াছি যে, জীবনের চরম সত্যগুলি কেবল প্রেমের ভিতর দিয়াই উপলব্ধি করা যায় ; যুক্তির ভিতর দিয়া উপলব্ধি করা যায় [illegible]

[illegible] নিয়মিত ও কর্ত্তব্যজ্ঞান সরোজনলিনীর চরিত্রের একটি [illegible]। ইহা চিঠিপত্র লেখা এবং দেনা পরিশোধ করা,

এই দুই ব্যাপারে বিশেষ করিয়া প্রকাশ পাইত। কাহারও নিকট হইতে কোন চিঠি পাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিতেন; এক দিনের জন্যও চিঠিখানার উত্তর দিতে দেরি হইলে তিনি নিজেকে দোষী জ্ঞান করিতেন। তাঁহার হাতের লেখাগুলি যে কেবল মুক্তার মত সুন্দর ও স্পষ্ট ছিল তাহা নয়, চিঠিতে তিনি যেন নিজের প্রাণটীকে খুলিয়া সহজ সুন্দর ভাষায় ঢালিয়া দিতেন। তাঁহার চিঠি যিনি পাইয়াছেন তিনিই আদর করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন।

কোন জিনিস কিনিবার সময় সরোজনলিনী বরাবর নগদ দাম দিতে ভাল বাসিতেন। কোন কারণে বাকীতে কিনিলে যখনই দামের জন্য বিল আসিত তখনই দাম দিয়া ফেলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িতেন। মাসের শেষে যতক্ষণ গত মাসের সব দেনা শোধ না করিতেন ততক্ষণ তিনি প্রাণে সোয়াস্তি লাভ করিতেন না। দোকানদাররা অনেক সময় ইচ্ছা করিয়া দুই তিন মাসের বিল জমাইয়া রাখিতে চাহিত। সে সকল ক্ষেত্রে সরোজ-নলিনী দোকানে গিয়া মাসের বিল মাসের শেষে পাঠাইবার জন্য দোকানদারকে তাগাদা দিয়া আসিতেন। একদিকে দোকানদারগণ যেমন তাঁহার এই অনন্য-সাধারণ ব্যবহার দেখিয়া অবাক হইত, অপরদিকে আমি অনেকবার তাঁহাকে বলিতাম, "লোকে দেনার বিলই যদি না দেয় তবে দেনা শোধ করিবার জন্যে তুমি এত ব্যস্ত হও কেন, বুঝি না। বরং আমরা যদি দেরিতে দাম দিতে পারি তবে ত আমাদেরই লাভ ও সুবিধা।" সরোজনলিনী ইহার উত্তরে বলিতেন,—"কি জানি কেন; কিন্তু কাহারও দেনাদার হইয়া একদিন মাত্র থাকিলেও আমার প্রাণে অশান্তি হয়।"

মহিলা-সমিতিগুলির প্রত্যেক অধিবেশনে সরোজনলিনী সমবেত

মহিলাদিগকে যে অভিভাষণ করিতেন, তাহার শেষে মহিলা-অনুষ্ঠানের সার্থকতার জন্য ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেন। এই ধর্ম্ম প্রাণতা তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে পরিলক্ষিত হইত।

বঙ্গীয় স্বাস্থ্য-বিভাগের খ্যাতনামা বক্তা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন রায় মহাশয় মহিলা-সমিতির অধিবেশন ও প্রদর্শনী ইত্যাদি উপলক্ষে প্রায়ই স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে ছায়াচিত্র সাহায্যে বক্তৃতা করিতে যাইতেন। তিনি সরোজনলিনীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"তিনি এতই সরল ও উদার ছিলেন যে, কখনও আপনাকে একজন উচ্চপদস্থ কলেক্টারের পত্নী মনে করিতে পারিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই ভাবিতেন যে তিনি একজন সামান্য বঙ্গমহিলা, ও যাহাতে তাঁহার অপরাপর ভগ্নীগণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয়, এই চেষ্টাই সর্ব্বদা করিতেন। কি গরীব, কি ধনী, কি শিক্ষিতা, কি অশিক্ষিতা, সকল রমণীর জন্যই তাহার প্রাণে সমান ভালবাসা ছিল। শিউড়িতে একবার মাননীয় গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডশে মহোদয় গিয়াছিলেন। তথাকার গার্ডেন পার্টিতে তিনি শ্রীমতী দত্ত মহাশয়ার সঙ্গে আলাপ করিয়া জলযোগের পর চলিয়া গেলেন। তাহার দুই মিনিট পরেই যখন সকলেই বাজী পোড়ান দেখিতে ব্যস্ত তখন এই মহানুভবা মহিলা শিউড়িস্থিত হেতমপুর রাজবাটীর প্রাঙ্গনের এক প্রান্তে যেখানে অনেকগুলি বাউরির মেয়ে তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের সুখদুঃখে সহানুভূতি জানাইয়া যাহাতে তাহাদের মঙ্গল হয়, সেই বিষয়ে উপদেশ দিতেছিলেন ও তাঁহার মাতৃহৃদয় তাহাদের প্রতি স্নেহে আপ্লুত হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহার নিজের কাপড় যে ময়লা হইয়া যাইবে তাহা একেবারেই ভুলিয়া গিয়া বাউরিদের পোঁটাপড়া



বঙ্গের গভর্ণর লর্ড রোণাল্ড্‌সে কর্ত্তৃক সিউড়ি-প্রদর্শনীর
দ্বার উদ্ঘাটন উপলক্ষে

নোংরা ছোট ছোট ছেলেগুলিকে কোলে তুলিয়া লইয়া আদর করিতে লাগিলেন ; এই সকল কারণেই তিনি শিউড়ীতে গরীবের পরম বন্ধু বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রতাপান্বিত কালেক্টরপত্নী বলিয়া কেহ তফাতে রাখিত না। বরং গরীবের বন্ধু বলিয়াই সকলে তাঁহাকে ভালবাসিত।

"আর একদিনের কথা আমার মনে পড়ে, যে দিন বাঁকুড়ায় তিনি তাঁহার কুঠির সকল ঘরগুলি অবাধে তথাকার মহিলাসমিতির অধিবেশনের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। মেঝের উপর দামী কার্পেট পাতা ছিল ও ঘরগুলি এত সুচারুরূপে সাজান ছিল যে, ঘরের ভিতর দিয়া হাঁটিতে মায়া হইত। কিন্তু তিনি এই সকল ঐশ্বর্য্য একেবারেই ভুলিয়া গিয়া যে সকল মহিলা তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সমাদর করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। একজন কালেক্টর-পত্নী নগণ্য গরীব মহিলাদের সহিত কি স্নেহের ও ভালবাসার সহিত আলাপ পরিচয় করিতেছেন, তাহাও একটি দেখিবার বিষয়,—যেন তিনি তাহাদেরই একজন ও তাহাদের দুঃখ-অভিযোগ যেন তাঁহারই বেদনা ও অভিযোগ! বাঙ্গালীর বাড়ীর ছেলেমেয়ে মা ছাড়া হয় না, কাজেই এখানেও তাহারা মায়েদের সহিত আসিয়াছিল ও তাঁহার মেঝেতে পাতা সেই দামী কার্পেট নানাপ্রকারে ময়লা করিতেছিল। তাহাতে তিনি কোনরূপ দুঃখিত না হইয়া বরং যাহাতে শিশুরা ময়লা না থাকে ও ময়লা থাকিলে যে রোগ হয় তাহা তাহাদের মাতাদিগকে বলিয়া দিতেছিলেন। মিটিং এর পর সন্দেশ বিতরণের পালা আসিল ; তখন তিনি যেন মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণা-রূপে খাবার বিতরণ করিতে লাগিলেন ; পাছে কোন ছেলে না পায় তাহার প্রতি তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন। বহু ধনী, মধ্যবিত্ত, ও গরীব মহিলা

সমবেত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে কোনই তারতম্য ছিল না, উপরন্তু তিনি মধ্যবিত্ত ও গরীব মাতাদের এবং তাহাদের শিশুদের অধিকতর আপ্যায়িত ও যত্ন করিতেছিলেন, যাহাতে তাহারা কোনরূপে ক্ষুণ্ণ না হয়।

"ইহাঁর সমদর্শিতার কথা আর কত বলিব। আর একদিনের কথা এখনও খুব ভালরূপে মনে আছে, যেদিন এই কালেক্টর-পত্নী তাঁহার মর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া বাঁকুড়ায় একটি অতিশয় ময়লা ও সরু গলির ভিতর এক মহাজনের বাড়ীতে সহরের সকল মহিলাকে আহ্বান করেন। আমার বেশ মনে আছে, তিনি নিজে গাড়ীগুলি বাড়ী বাড়ী পাঠাইয়া সমস্ত সহরের মহিলাদের আনাইবার জন্য কিরূপ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। নিজে দরজায় দাঁড়াইয়া গাড়ী হইতে হাত ধরিয়া সকলকে নামাইয়া লইতে লাগিলেন ও যে সকল মাতাদের কোলে শিশুসন্তান ছিল, নিজেই আয়ার মত তাহাদিগকে ধরিতে লাগিলেন ও মাতাদের নামিতে বলিলেন। সেই মুহূর্ত্তে কেহ দেখিলে কখনই চিনিতে পারিত না যে, ইনিই জেলার কালেক্টর পত্নী। তখন তিনি একাধারে মূর্ত্তিমতী বাঙ্গালী কন্যা, স্ত্রী, মাতা ও স্নেহশীলা বঙ্গরমণী। যেন প্রাণভরা স্নেহ দুকূল ছাপাইয়া পড়িতেছে! কিসে মাতাদের মঙ্গল হইবে, কিরূপে গৃহস্থদের আয় বাড়ান যায়, কেমনে বঙ্গবিধবাদের একটি নিজেদের ভরণপোষণের উপায় হয়, কিরূপে হাঁসপাতালের গরীব রোগীদের সাহায্য করা যায় ও কিরূপে বাঙ্গালী রমণীদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয়, এই চিন্তা লইয়াই যেন তিনি জগতে আসিয়াছিলেন।"

বাঁকুড়া কলেজের প্রিন্সিপালের পত্নী বিদুষী ইংরেজ-রমণী শ্রীমতী গারট্রুড্ ব্রাউন, বি, এ, সরোজনলিনীকে বিশেষ ভাল করিয়া জানিতেন।

।তিনি সরোজনলিনীর চরিত্রের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"যদিও আমি একজন ইংরাজ মহিলা তথাপি সরোজনলিনীর পরলোকগমনে আমি যেন আমার নিজের কোনও নিকট বন্ধুকে হারাইয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে। আমি ইংরাজ, তিনি বাঙ্গালী ; আমার ধর্ম্মমতও তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; তথাপি আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে কি এক প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল ! কি এক আকর্ষণের দ্বারা তিনি আমাকে তাঁহার অতি নিকটে টানিয়া লইয়াছিলেন ! এখন ভাবিয়া দেখিতেছি যে, এই বন্ধুত্ব এবং আকর্ষণের মূল সূত্র ছিল আমাদের উভয়ের কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে। কিসে আমরা এদেশের স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইব এবং কি করিয়া আমাদের সমুদয় শক্তি ও সামর্থ্য তাহাদের সেবায় নিয়োগ করিব, এই চিন্তা এবং চেষ্টার মধ্য দিয়াই আমরা পরস্পরকে চিনিয়াছিলাম এবং কালে সেই পরিচয় আমাদিগের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিল।

"১৯২২ সালে সরোজনলিনীর সহিত আমার বন্ধুত্ব জন্মে ; কিন্তু তাহার অনেক পূর্ব্বে, ১৯০৩ সালে আমার ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বেই, তাঁহার পরিচয় পাইয়াছিলাম। বাঁকুড়া হইতে আমার জনৈক বন্ধু বিলাতে আমার বাড়ীতে আসিয়া কিছুকাল ছিলেন। তিনি সরোজনলিনীর একখানি ফটোগ্রাফ দেখাইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এই সুন্দরী বাঙ্গালী মেয়েটী অতি আশ্চর্য্য রকম টেনিস্ খেলিতে পারেন।*

"তখনকার দিনে অর্থাৎ ১৯০৩ সালে বাঙ্গালী মেয়েদের টেনিস্ খেলায়

* ১৯০৩ সালে সরোজনলিনীর পিতা বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

এরূপ কৃতিত্ব দেখান খুব বিস্ময়ের বিষয় ছিল। ছবি দেখিয়া সেই হইতে সরোজনলিনীর সম্বন্ধে আমার মনে একটা ছাপ পড়িয়া গিয়াছিল।

"কতকগুলি গুণ থাকার জন্য সাধারণতঃ ইংরাজ মহিলাদিগের একটা বিশিষ্টতা আছে। সরোজনলিনীর চরিত্রে ইংরাজ-মহিলাসুলভ এই সকল গুণ দেখিয়াই আমি প্রধানতঃ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। এই সকল গুণের সহিত বাঙ্গালী মেয়েদের স্বভাবসুলভ শালীনতা এবং লাজ-নম্র ব্যবহার তাঁহার প্রকৃতিকে এমন মধুর এবং কোমল করিয়াছিল যে, তাঁহার সহিত একবার আলাপ করিলে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকা যাইত না। বাঙ্গালী মেয়েদের চরিত্রে এই শালীনতা এবং লাজ-নম্র ভাবটাই আমাদিগের নিকট অত্যন্ত মধুর বলিয়া মনে হয়। সরোজ-নলিনীকে দেখিয়া আমার কেবলই মনে হইত যে, ইনি ইংরাজ মহিলাদের সদ্‌গুণগুলি সব আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন অথচ বাঙ্গালী মেয়েদের জন্মগত বিশিষ্টতাটুকুও হারান্ নাই। ইহাই ত প্রকৃত মনুষ্যত্বের লক্ষণ! অপর জাতির ভাল গুণগুলি অর্জ্জন করিতে গেলে যে নিজের বিশিষ্টতাটুকু খোয়াইতেই হইবে তার মানে কি? সরোজনলিনীর চরিত্রে এই সামঞ্জস্য দেখিয়াছিলাম।

"মিসেস্ দত্ত খুব ভাল টেনিস্ খেলিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি বরাবর সাড়ী পরিয়া খেলিতেন এবং কথনও তাঁহার স্বভাবসুলভ শালীনতা বর্জ্জন করিতেন না। আমরা তাঁহার এই সুন্দর সমন্বয়ের শক্তি দেখিয়া অনেক সময় অবাক হইয়া থাকিতাম।

"তাঁহার একটা বাগান ছিল যাহা দেখিয়া আমাদের সকলেরই মনে ঈর্ষা হইত। ফুলে, ফলে, সবজিতে ভরা সে কি সুন্দর বাগান!

সে বাগান দেখিলেই মনে হইত যে আরাম-কেদারায় শুইয়া মালীর উপর হুকুম চালাইয়া এরূপ সাজানো বাগান তৈরী করা যায় না। এর পশ্চাতে প্রতিদিনের অনেক ঘণ্টার নীরব পরিশ্রম এবং অসীম অধ্যবসায় পড়িয়া রহিয়াছে। সরোজনলিনী প্রত্যহ অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজহস্তে বাগানের কাজ করিতেন; তাঁহার মালী তাঁহাকে সাহায্য করিত। গৃহকর্ত্রীর এইরূপ ঐকান্তিকতা দেখিয়া মালীও তাহার কাজে উৎসাহিত হইত। বাহিরের নানাকাজ সত্বেও সরোজনলিনী তাঁহার সংসারকে এক দিনের জন্যও উপেক্ষা করেন নাই। তিনি অতি সুগৃহিণী ছিলেন এবং তাঁহার গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার আদর্শ ছিল। সকল কার্য্যের মধ্যেই তাঁহার একটা শৃঙ্খলা ছিল। অতি প্রত্যুষে উঠিয়াই তিনি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বেড়াইতে বাহির হইতেন, পরে গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম সারিয়া নানাবিধ ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক, মাসিক পত্রিকা ও সংবাদপত্রাদি পাঠে মনোনিবেশ করিতেন। এইরূপে দেশের সমসাময়িক ঘটনার সহিত নিজেকে সুপরিচিত রাখিতেন। তাঁহার গৃহ আতিথেয়তার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ইংরাজ, বাঙ্গালী, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই অতি সমাদরের সহিত তাঁহার গৃহে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হইতেন এবং তাঁহার ব্যবহারে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে একটা বন্ধুত্ব স্থাপনের সুযোগ হইতেছিল।

"এদেশের অনেক পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোকের সহিত আমার আলাপ পরিচয় আছে। তাঁহারা, প্রায়ই আধুনিক-শিক্ষিতা এবং পাশ্চাত্য বেশভূষাবলম্বিনী মহিলাদিগের সম্বন্ধে নানারূপ কঠোর সমালোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রধান অভিযোগ এই যে, আধুনিক বিদুষীরমণীগণ তাঁহাদের জাতীয় বিশিষ্টতা হারাইয়া ফেলিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়

সরোজনলিনীর সম্বন্ধে তাঁহাদের কাহাকেও কোনও অপ্রিয় সমালোচনা করিতে শুনি নাই।

"তাঁহার চরিত্রে আর একটা বিশিষ্টতা দেখিয়াছিলাম, তাঁহার সরলতা এবং স্পষ্টবাদিতা। যে বিষয় তিনি পছন্দ করিতেন না সে সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টই বলিয়া দিতেন, তা' তিনি এদেশীয়ই হউন আর ইউরোপীয়ই হউন। তিনি নিজে কাহাকেও তোষামোদ করিতে পারিতেন না, কিম্বা অন্যের তোষামোদও সহ্য করিতে পারিতেন না। অথচ কাহারও মধ্যে কোনও সদ্‌গুণ দেখিলে সর্ব্বাগ্রে তাহা স্বীকার করিতেন এবং কেহ কোনও শোকে অথবা দুঃখে পড়িলে সর্ব্বাগ্রে তাহার নিকটে আসিয়া হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ও সহানুভূতি ঢালিয়া দিতেন।

"সরোজনলিনীর প্রাণে অনেক উচ্চ আদর্শ জাগিয়া উঠিয়াছিল। সাধারণতঃ এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের চিন্তা ও কর্ম্মক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ। তাঁহাদের দৃষ্টি অন্তঃপুরের পাষাণ প্রাচীরের বাহিরে প্রায়ই যায় না। সেবাই যে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম একথা তাঁহারা অবশ্য বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা পাইয়া থাকেন; কিন্তু সে সেবার গণ্ডী গৃহের বাহিরে নহে—নিজের স্বামী এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্যেই তাহা সীমাবদ্ধ। এই সেবার আদর্শ নিন্দনীয় না হইলেও এ কেবল স্বার্থজড়িত সেবা; কেবল আপনার জনের সেবাতেই এই আদর্শ সঙ্কীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই আপনার জনের গণ্ডীর বাহিরেও এক বৃহত্তর সমাজ, দেশ এবং সংসার পড়িয়া রহিয়াছে; সে বৃহত্তর পৃথিবী যে, নারীর সেবা পাইবার জন্য হাহাকার করিয়া মরিতেছে! আপনার জনের সেবা করা স্বাভাবিক, কিন্তু পরের সেবা করাই প্রকৃত ধর্ম্ম; কারণ সেইখানেই সেবার আসল স্বরূপ

এবং সার্থকতা ফুটিয়া বাহির হয়। এ সেবার মধ্যে স্বার্থ-সংস্পর্শজাত কোনও মলিনতা নাই। মানব-হৃদয়ের নিঃস্বার্থ প্রেম এবং অফুরন্ত ভালবাসাই ইহার উৎস। এই প্রেমের স্পর্শ পাইবার জন্য দুঃখতাপক্লিষ্টা কত অসহায়া নারী হাহাকার করিয়া মরিতেছে, কে তাহাদিগের সেই আকুল ক্রন্দন শোনে! সরোজনলিনী এই আকুল আহ্বান শুনিয়াছিলেন এবং তাহাতে সাড়া দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কোমল হৃদয়ের সমস্ত প্রেম এবং সেবা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন এবং অক্লান্ত প্রাণে এই সেবাযজ্ঞে আত্মদান করিয়াছিলেন। এক-একবার মনে হইত তিনি এই যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন ইহার আকর্ষণ কি? ইহার পুরস্কার কোথায়? কিন্তু এই সেবায় মগ্ন থাকিয়া তাহার মুখে যে আনন্দজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিত তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিতাম যে এই সেবার আনন্দই তাহার পুরস্কার।

"যখন শুনিলাম যে সরোজনলিনী আর ইহজগতে নাই, তখন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মহিলা-সমিতির সভ্যগণ আমার বাড়ীতে আসিয়া মিলিত হইলেন এবং অশ্রুজলের মধ্যে সকলেই যে কথাটি বলিতে লাগিলেন আমরা তাহার মধ্যেও একটা বিশিষ্টতা দেখিলাম। তাঁহারা সকলে একবাক্যে বলিতে লাগিলেন:—'তাঁহাকে কত ভালবাসিতাম তাহা আজ কেমন করিয়া প্রকাশ করিব? পরের সেবাকেই তিনি তাঁহার জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছিলেন। আজ আমরা তাঁহারই সেই ব্রতকে আমাদের করণীয় বলিয়া বরণ করিয়া লইব; ইহাতে তিনি দেখিবেন যে আমরা তাঁহাকে কত ভালবাসিতাম!'

"আজ সত্যই মনে হইতেছে—তিনি মরেন নাই—জীবন্ত ও জাগ্রত হইয়া তিনি এই নরলোকে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া আছেন—মৃত্যুই আজ মরিয়াছে, তিনি মরেন নাই!"

দাম্পত্য প্রেম

সরোজনলিনী বিবাহকে একটা পরম পবিত্র বন্ধন বলিয়া মনে করিতেন। আমাদের বিবাহ-উপলক্ষে ছাপানো পদ্ধতি অতি যত্নে রাখিয়া দিয়াছিলেন ও মাঝে মাঝে তাহা আহ্লাদের সহিত পড়িতেন।

আমাদের বিবাহের মাসেক কাল পূর্ব্ব হইতে তাঁহার পিতা কলিকাতায় এলগিন্ রোডে একটা বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন। সেখানেই আমাদের বিবাহ হয়। তার পরে যখনই আমরা এই বাড়ীর পাশ দিয়া গিয়াছি, সরোজ-নলিনী প্রতিবার বলিতেন—"এই বাড়ীটা দেখিলেই আমার মনে কেমন একটা পবিত্র ভাব জাগিয়া উঠে ও বড় আনন্দ হয়। যদি কোন দিন আমাদের সে রকম টাকা হয় এ বাড়ীটা কিনিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে।"

আমাকে যখন ক্যাম্প অথবা অন্য কোথাও কার্য্যোপলক্ষে ২।৩ দিনের জন্যও তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে হইত তখন তিনি প্রত্যহ আমাকে একখানা করিয়া চিঠি লিখিতেন। এই নিয়মের লঙ্ঘন কখনও হয় নাই। গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে আমাকে কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার আগে দার্জ্জিলিং আসিতে হইয়াছিল। ছেলের স্কুলে তখন ছুটি না হওয়ায় সরোজনলিনী ছেলেকে ছাড়িয়া আসিলেন না; কয়েকদিন পরে আসিলেন। এই সময়ে একদিন আমি একজন বিশেষ উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী বন্ধুর বাড়ীতে বসিয়া গল্প করিতেছি তখন তাঁহার সেদিনকার ডাকের চিঠি পাইলাম ও খুলিয়া দেখিলাম। বাংলায় লেখা ১০।১২ পাতার লম্বা চিঠি দেখিয়া বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত লম্বা চিঠি আপনাকে কে লিখেছে?" আমি বলিলাম, "আমার



স্ত্রীর চিঠি।" তিনি ত ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। আমি যখন বলিলাম, আমরা প্রত্যহ পরস্পরের কাছে চিঠি লিখি, তখন তিনি অবাক্ হইয়া পড়িলেন ও বলিলেন, "১৮ বৎসর বিবাহের পরেও আপনাদের এত প্রেম!" এই কথা সরোজনলিনীকে আমি লিখি। তার উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন,—"আমার·· ·· স্বামী যে আমায় রোজ চিঠি লেখেন, তা লোকে জানলে আমার খুব গর্ব্ব হয়, বুকটা একেবারে ফুলে উঠে। বস্তা ত * প্রায়ই ঠাট্টা করে বলে, 'বুড়ো বয়সে এদের প্রেম দেখনা!' ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন মরণের দিন পর্য্যন্ত তোমার এই রকম ভালবাসা পাই। আমি জগতে আর কিছু চাই না।"

২৩শে সেপ্টেম্বর আমাদের বিবাহের বাৎসরিক দিন। গত বৎসর এই তারিখে ছেলের স্কুল বন্ধ না হওয়ায় সরোজনলিনী আমার সঙ্গে দার্জ্জিলিং আসিতে পারেন নাই। আমাদের বিবাহের বাৎসরিক স্মৃতির উপহার স্বরূপ দার্জ্জিলিং হইতে ৪ জোড়া কানের দুল পাঠাইয়াছিলাম ও লিখিয়াছিলাম যে ইহার মধ্যে অন্ততঃ দুই জোড়া তাঁহাকে রাখিতে হইবে। ইহার উত্তরে তিনি যে চিঠিখানি আমাকে লিখেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"৫৮ নং চৌরঙ্গী,
"২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪।

"আমার প্রাণের দেবতা,

"কাল তোমায় তাড়াতাড়ি একখানা ছোট্ট চিঠি লিখতে হয়েছিল। কাল যেই তোমায় চিঠি লিখতে বসেছি অমনি নিনা † এলো। নিনা বসে

* "বস্তা" সরোজনলিনীর মেজ ভাইয়ের ডাকনাম।

† "নিনা" সরোজনলিনীর কনিষ্ঠা ভগিনী নির্ম্মলনলিনীর ডাকনাম।

থাকতে আর বড় চিঠি লিখতে সাহস হলো না। ওরা কেউ থাকলে চিঠি লেখার সময় যা বিরক্ত করে তা আর কি বলব। যাহোক বিকেলে তোমার ২৩শের লেখা চিঠিখানি পেয়ে সত্যি বড় আনন্দ হলো। সত্যি কি আমি তা হলে তোমায় সুখী করতে পেরেছি গুরুদেব? তোমার সরো যে বড় বদ্ মেজাজী। তোমার চিঠিটা পড়ে কাল বিকেল থেকে মনটা বড় ভাল লাগছে ও মনে হচ্ছে তা হলে জীবনটা আমার সার্থক হয়েছে। যাঁকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসি, তিনি সুখী হয়েছেন সেই আমার জীবনের সার্থকতা। গুরুদেব আমার, আমি আর কিছু চাই না; শুধু তোমার প্রাণভরা ভালবাসা চাই, যতদিন বেঁচে থাকি। আর তোমার ঐ দুটি······পায়ে মাথা রেখে যেন মরতে পাই। ভগবানের কাছে আমার এই প্রার্থনা। যদি সতী হই তা হলে ভগবান আমায় এ সুখ থেকে কখনও বঞ্চিত করবেন না। কাণের দুলগুলির কথা আমিত তোমায় আগেই লিখেছি। আশা করি সেগুলি পছন্দ হয়নি বলায় তোমার মনে কষ্ট দিই নি গুরুদেব। আমার ওসব দুল ইত্যাদিতে দরকার নেই। তোমাকে পেয়েছি আর আমার গহনার কি দরকার? যাহোক তুমি পাঠিয়েছ সেজন্য এক জোড়া আমাদের বিয়ের দিন বিয়ের সময়টাতে পরেছিলাম। ওগুলো অপছন্দ হওয়ায় যদি দোষ হয়ে থাকে ত ক্ষমা করো। আমার কবি বরের কল্পনার বাসর ঘরে কি আমি গিয়ে পৌঁছেছিলাম? আমার কবি বরটি ত আমার প্রাণে সর্ব্বদাই জড়িত আছেন। তোমার টেলিগ্রামটাও সময় মত পেয়েছিলাম। তুমিত আমায় কত জিনিস দিলে; আমি ত তোমায় কিছু দিই নি, প্রাণ আমার। তুমিত জান আমার যা কিছু আছে সব তোমায় দিয়েছি, আর দেবার কিছু নেই যে। টাকা পয়সা থাকলে না হয় একটা উপহার দিতাম। তাত নেই। আর ভাল

লাগছে না, কবে যে অক্টোবরের প্রথম তারিখ আসবে ; বড় দেরি হচ্ছে। তোমার কাছে যাবার জন্য আমরা দুজনেই বড় উৎসুক হয়ে পড়েছি। তুমি ছাড়া কলকাতাও ভাল লাগে না। তোমার শালীরা বলে তুমি ছাড়া এ বাড়ী অন্ধকার। আমি ওদের উপর রাগ করি। সেটা দেখান অবশ্য। আমি যে ঐ শূন্যতা নিজেই অনুভব করি।"

এই চিঠি লিখিবার কয়েকদিন পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে লিখেছিলাম, ২৩শে সেপ্টেম্বর দিনটা (আমাদের বিবাহের বাৎসরিক দিন) তাঁহার মনে আছে কি না। তাহার উত্তরে তিনি তাঁহার ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠিতে লিখিয়াছিলেন :—

"২৩শে সেপ্টেম্বর খুব মনে আছে। ওদিন কি আমি ভুলতে পারি ? এই চিঠিটা যখন পাবে * তখন সরো তোমারই কথা সমস্ত দিন ভাবছে জেনো। বড় খারাপ লাগছে, তোমাকে কাল কাছে পাব না। যাহোক জন্ম-জন্মান্তবে যেন তোমাকে পাই—আমার জীবনের আলো তুমিই। এই দিনেতে আমি বাপ-মাকে ছেড়ে কোন অজানা লোকের কাছে যাই নি। তুমি যে চিরকালের আমারই। এটা যে শুধু আমাদের পৃথিবীতে মিলনের দিন ! তুমি ত আমাকে এই দিন উপলক্ষে তাগা দিচ্ছ ! আবার কাণের দুল কেন পাঠিয়েছ ? তুমি বড় দুষ্টু। গহনা আমি চাই না। আমার ত গহনার লোভ নেই। তুমিই ত আমার গহনা। কাণের দুলগুলি আজ আসে নি, যদি কাল আসে ত এক জোড়া পোর্‌ব, কারণ তুমি কষ্ট করে পাঠিয়েছ। অন্যগুলো সঙ্গে আনব। আমি গহনা চাই না। আমি এই দিনে শুধু তোমাকে চাই।——সরো কি তোমায় সুখী করতে পেরেছে ?"

---

* ২৩শে সেপ্টেম্বর অর্থাৎ আমাদের বিবাহের বাৎসরিক দিন।

কাপের ভুলগুলি সম্বন্ধে ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিয়াছিলেন :—
"দামগুলো তুমি মুছে দিলেও আমি টের পেয়েছি। তুমি যদি দুঃখিত না হও তা হলে আমি ওগুলির কোনটি রাখব না। আজকাল আমাদের যা খরচ, তাতে মিছামিছি এত টাকা খরচ করা কি ঠিক গুরুদেব ?"

ইহার উত্তরে আমি লিখিয়াছিলাম যে, এগুলি আমি উপহার দিতেছি সুতরাং এগুলির দামের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। তার উত্তরে তিনি লিখেন :—"দামের সঙ্গে আমার সংস্রবই ত বেশী। তোমার বেঙ্কের খবর কি তুমি রাখ, না আমি রাখি, দুষ্টু!"

আমি যখন কোন সভায় বক্তৃতা দিতে যাইতাম, তখন তিনি আমার সঙ্গে যাইতে ব্যগ্র হইতেন। আমি যখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গত বৎসর বজেট আলোচনার সময় বঙ্গের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে বক্তৃতা দিই, তখন তিনি কৌন্সিলে মহিলাদিগের বসিবার গেলারিতে থাকিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

গত বৎসর আমি যখন তাঁহার যাইবার কয়েক দিন পূর্ব্বে কার্য্যোপলক্ষে দার্জ্জিলিং আসিয়াছিলাম, তখন সেখানে রামমোহন রায় স্মৃতিসভায় আমাকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। ইহা জানিবার পর সেই সভার দিন সরোজনলিনী লিখিয়াছিলেন—"রামমোহন স্মৃতি-সভার ত আজ মিটিং; তুমি সভাপতি হবে আর আমি দেখতে পাব না সেজন্য বড় দুঃখ হচ্ছে।"

অসুখ-বিসুখে আমাকে সেবা করাকে সরোজনলিনী তাঁহার একটি পরম অধিকার বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং তাহা করিবার সুযোগ না পাইলে আপনাকে বারপরনাই বঞ্চিত বলিয়া

মনে করিতেন। গত বৎসরের যে সময়ের কথা ইতিপূর্ব্বে লেখা হইয়াছে, সেই সময়ে আমার দার্জ্জিলিংএ মাত্র একদিনের জন্য জ্বর হইয়াছিল। তাহা পরে জানিতে পারিয়া সরোজনলিনী লিখিয়াছিলেন :—"বেচারা, তোমার অসুখের সময় আমি থেকে সেবা করতে পারলাম না; মনে বড় কষ্ট হচ্ছে।"



সঙ্গীত-প্রিয়তা

সরোজনলিনী অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার সঙ্গীত-প্রিয়তার বিষয় এই জীবনীর নানা স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি বেহালা, সেতার, এস্রাজ, হারমোনিয়াম ও পিয়ানো বাজাইতে পারিতেন এবং নূতন গান শুনিলেই শিখিয়া ফেলিতেন। আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমি গয়াতে এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। সরোজনলিনী সেখানে নববধূরূপে আমার সঙ্গে যান। সেখানে তখন কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় সিনিয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সরোজ-নলিনীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন ও নিজের কয়েকটি গান সরোজ-নলিনীকে নিজে হারমোনিয়াম বাজাইয়া শিখাইয়াছিলেন। সরোজ-নলিনীর গলার সুরের বিশেষ করিয়া চর্চ্চার জন্য তিনি একজন হিন্দুস্থানী ওস্তাদ মনোনীত করিয়া দেন। তাঁহার হাসির গান গাহিয়া তিনি প্রায়ই আমাদিগকে শুনাইতেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমান দিলীপকুমার রায় এবং কন্যা শ্রীমতী মায়াদেবী তখন বালক-বালিকা ছিলেন। তাঁহারা প্রায়ই দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান ইত্যাদি অভিনয় করিয়া শুনাইতেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন কলিকাতায় ছিলেন তখন একদিন আমাদিগকে নিজের নাটক "দুর্গাদাস"এর অভিনয় দেখাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া ষ্টার থিয়েটারে লইয়া যান। সরোজনলিনী দ্বিজেন্দ্রলালের—

"হেসে নাও দুদিন বইত নয়"

এই গানটি প্রায়ই গাইতে ভালবাসিতেন।

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় ও তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী মায়া দেবী সরোজ-নলিনীকে পিতৃবন্ধু হিসাবে বরাবরই বিশেষ শ্রদ্ধা কারতেন এবং শ্রীযুক্তে দিলীপকুমার তাঁহার গানের বৈঠক ইত্যাদিতে সরোজনলিনীকে বিশেষ করিয়া নিমন্ত্রণ করিতেন। গত বৎসর সরোজনলিনীর একটা নূতন হারমোনিয়াম কিনিবার দরকার হয়। তিনি বলিলেন—"আমি খুব ভাল সুর-ওয়ালা হারমোনিয়াম চাই ; এই হারমোনিয়াম দিলীপকে পছন্দ করিয়া দিতে হইবে ; আর কেহ পছন্দ করিলে আমার মনোমত হইবে না।" দিলীপকুমার সরোজনলিনীর অনুরোধ আহ্লাদের সহিত রক্ষা করিলেন ও তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দোকানে গিয়া হারমোনিয়াম পছন্দ করিয়া দিলেন।

আমাদের বীরভূম থাকা-কালীন প্রায়ই আমরা বোলপুরে শান্তি-নিকেতনে যাইতাম। শান্তিনিকেতনের ঠাকুর-পরিবারের মহিলারা সরোজনলিনীকে বড়ই স্নেহ ও আদর করিতেন। একদিন আমরা সন্ধ্যার পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে যাই। সরোজনলিনী কখনো রবীন্দ্র নাথকে গান গাহিতে শুনেন নাই। আমি ছাত্রাবস্থায় রবীন্দ্র নাথকে অতি চমৎকার গাইতে শুনিয়াছি তাহা আমার নিকট হইতে জানিয়া রবীন্দ্রনাথের গান শুনিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়াছিলেন ও সেদিন তাঁহাকে গান করিতে অনুরোধ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে নানা প্রকার ওজর-আপত্তি করিলেন কিন্তু সরোজনলিনীর অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, দু'তিনটা গান গাহিলেন। তাঁহার শান্তিনিকেতনের আশ্রমের ছোট বাড়ীর দোতালার ছাতের উপরে চাঁদের আলোতে সেই গান বড় সুন্দর শুনাইয়াছিল। কোন যন্ত্র ছিল না ; রবীন্দ্রনাথ হাততালি দিয়া তাল রাখিয়া গাহিলেন। তার মধ্যে একটি গান ছিল—

"আয় আয়রে পাগল

ভুল্‌বি রে তোর আপনাকে"

এটি সরোজনলিনীর এত ভাল লাগিয়াছিল যে, আমার বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে ইহার স্বরলিপি লিখাইয়া লইলেন। এই গানটা অভ্যাস করিয়া তিনি প্রায়ই গাহিতেন।

আমাদের জাপান-ভ্রমণের সময় আমরা কোবে সহরেব "কোতো যো-গাক্কো" নামক মেয়েদের হাই স্কুল দেখিতে যাই, সেই স্কুলেব কর্ত্তৃপক্ষগণ সরোজনলিনীকে স্কুলের বিরাট সভা-মন্দিরে সাড়ে সাত শত জাপানী মেয়ের সামনে একটা ভারতীয় গান করিতে অনুরোধ করেন। সরোজনলিনী পিয়ানো বাজাইয়া রবীন্দ্রনাথের "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী" গানটি এত সুন্দর করিয়া গাহিয়াছিলেন যে, সেখানে সমবেত সাড়ে সাত শত জাপানী মেয়ে সেই গানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আরো দুইটি বাংলা গান গাহিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

স্বদেশী গান গাহিতে সরোজনলিনী বিশেষ করিয়া ভালবাসিতেন। আমি যখন বাঁকুড়ার কালেক্টর তখন একদিন আমাদের বাড়ীতে ডিনারে সেখানকার জজ, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইত্যাদি ইংরাজ বন্ধুরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। খাওয়ার পর স্বদেশী গানের কথা উঠিল। পুলিস সাহেব বলিলেন "আজকাল আর রাস্তাঘাটে স্বদেশী গান শোনা যায় না; এক সময়ে 'আমার দেশ' গানটা খুব শোনা যাইত, এই গানটি বড়ই উত্তেজনামূলক।" সরোজনলিনী বলিলেন "আপনারা যদি শুনিতে ইচ্ছা করেন তবে আমি 'আমার দেশ' গানটি গাইয়া শোনাইতে পারি।" পুলিশ সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"বলেন ।ক মিসেস্‌ দত্ত, আপনি স্বদেশী গান জানেন?" সরোজনলিনী উত্তর দিলেন:—"নিশ্চয়ই জানি;

আমি প্রায় সব স্বদেশী গানই জানি, আর 'আমার দেশ' গানটা গাইতে বিশেষ করিয়া ভালবাসি।" এই বলিয়া তিনি 'আমার দেশ' ও 'বন্দে মাতরম্' এই দুইটি গানই পরপর গাহিলেন।

আমার ও আমাদের ছেলের জন্মদিনে তিনি প্রতি বৎসর বিশেষ আমোদ-আহ্লাদ করিতেন। ভোরে উঠিয়া সমস্ত বাড়ী ও খাবার টেবিল ফুল দিয়া সাজাইতেন ও খাবার টেবিলে ফুলের পাপড়ি অথবা পাতা দিয়া—

"সুখ-বিজড়িত হয়ে চিরদিন
ফিরে আসে যেন এই শুভদিন"

এই কথাগুলি নিজের হাতে লিখিতেন।

জন্মদিনের উপহার দিয়া তিনি ঈশ্বরের কাছে মঙ্গল-প্রার্থনাসূচক উপাসনা করিতেন এবং আমার জন্মদিনে আমার পা ছুঁইয়া আমাকে প্রণাম করিতেন এবং নিজের হাতে সেদিন পায়েস রান্না করিয়া খাওয়াইতেন।

ছেলের জন্মদিনে তিনি প্রতিবৎসর আমার রচিত নিম্নলিখিত আশীর্ব্বাদসূচক গানটি গাহিতেন,

"এই শুভদিনে শুভাশীষ লও,
চিরজীবী আর চিরসুখী হও।
বিভুপদে মন রেখে সদা রত
পরহিত কর জীবনের ব্রত ;
হয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে পূর্ণ-মনোরথ
গুণী জ্ঞানী খ্যাতি লও।
অধর্ম্মেরে মনে নাহি দিয়ে স্থান

নির্ভয় হৃদয়ে হও আগুয়ান ;
জ্ঞান-ধর্ম্মবলে হয়ে বলীয়ান্
বিজয়-মাল্য শিরে লও।”

সকল সময়ের ও সকল অবস্থার উপযোগী গান সরোজনলিনী বিশেষ করিয়া জানিতেন ও বুঝিতেন। ছেলে যখন নিতান্ত শিশু ছিল, তখন তিনি তাহার মনোরঞ্জন ও আনন্দবর্দ্ধনের জন্য যে কত রকম গান করিতেন তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

“ঘুম পাড়ানী মাসী পিসী
ঘুমের বাড়ী এসো,
খাট নেই চৌকী নেই
চোক্ পেতে ব’সো ;
আয়রে হাওয়া ফুর্‌ফুরে
দূর হ মশা মাছি,
খোকা যদি ঘুমোয় তবে
আমি যে রে বাঁচি ;
এসো মাসী এসো পিসী
ঘুম দিয়ে যাও
বাটা ভরা পান দিব
গাল ভ’রে খাও ;
এই গালে দিনু চুমো
দেরে ঐ গাল,
ঘুমে ঘোর খোকা মোর
চুমোর মাতাল !”



স্কাউট-বেশে বীরেন্দ্র-সদয়

এই শ্রেণীর গানের ভাণ্ডার তাঁহার অফুরন্ত ছিল ও এত সুন্দর সুর করিয়া সেগুলি গাহিতেন যে তাহার প্রত্যেকটি এখনও আমার কাণে বাজিয়া আমাকে আনন্দ দিতেছে।

খোকা যখন একটু বড় হইল, তখন তিনি—

"ওই দেখ চাঁদ উঠেছে গগনে
করিবারে সুখী যত জনগণে"

এই শ্রেণীর গান গাহিয়া তাহাকে শিখাইতেন। সে আরো একটু বড় হইলে—

"এ ক্ষুদ্র পতঙ্গে প্রাণে ব'ধো না—
যন্ত্রণা দিও না—
তুমি যেমন কষ্ট পাও
সে তেমনি পায়, জানোনা!"

এই শ্রেণীর গান করিতেন।

খোকা যখন শৈশব অতিক্রম করিয়া বাল্যে পদার্পণ করিল, তখন তাহার প্রাণে ধর্ম্মভাব জাগাইবার জন্য

"তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে তুমি ধন্য ধন্য হে"

ইত্যাদি ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিয়া শিখাইতেন; আর স্বদেশ-প্রাণতা জাগাইবার জন্য "বঙ্গ আমার জননী আমার" হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় স্বদেশী গান শিখাইয়াছিলেন। বেহালা, হারমোনিয়াম ইত্যাদি যন্ত্রসঙ্গীতও তিনি নিজেই প্রথমে ছেলেকে শিক্ষা দিয়া তাহার প্রাণে সঙ্গীত-প্রিয়তা জাগাইয়া দিয়াছিলেন।

আমার গলার সুরের চর্চ্চা করিতে সরোজনলিনী আমাকে বরাবর বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতেন ও আমার সঙ্গে গলা মিলাইয়া গান

করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার গানের ভিতর দিয়া আমি আমার ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনের প্রেরণা ও আমার দৈনন্দিন জীবনের আনন্দের উপলব্ধি বিশেষ করিয়া পাইতাম।

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চলরে"

এবং

"আমার সকল কাঁটা ধন্য ক'রে ফুট্‌বে গো ফুল ফুট্‌বে
আমার সকল ব্যথা রঙ্গিন্ হয়ে গোলাপ হয়ে উঠ্‌বে"

এই দুইটি গান গাহিতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন।

তাঁহার পিতার জন্মদিন উপলক্ষেও বাড়ী-ঘর ফুল দিয়া সাজাইতে ও সঙ্গীত ইত্যাদিতে তিনিই অগ্রণী হইতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পিতার জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহারই উদ্যোগে মধুসূদনের মেঘনাদ-বধ কাব্য হইতে "প্রমালার লঙ্কাপ্রবেশ" এর অভিনয় তাঁহার ভাইবোন্ ও ভগ্নীপতিদিগকে লইয়া করা হইয়াছিল।

বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে সৈন্যদের সাহায্যার্থ টাকা তুলিবার জন্য তিনি বীরভূমে বালিকা-বিদ্যালয়ের মেয়েদিগকে নিজে সাজাইয়া এবং গান ও আবৃত্তি ইত্যাদি শিখাইয়া "শৈব্যা" নাটকের ও অন্যান্য কতকগুলি সুন্দর সুন্দর বিষয়ের অভিনয় করাইয়াছিলেন।

তাঁহার প্রাণের অনাবিল অফুরন্ত আনন্দের ধারা নির্ম্মল পবিত্র ও আনন্দময় সঙ্গীতের স্রোতে নিরন্তর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক সামাজিক জীবন নির্ম্মল আনন্দে প্লাবিত হইয়া যাইত।

স্বদেশ-প্রেম

স্বদেশ-প্রেম সরোজনলিনীর অস্থি-মজ্জাগত ছিল। যে সব ব্যবহার্য্য জিনিস দেশে তৈরী হয়, তাহার জায়গায় তিনি কথনো বিদেশী জিনিস ব্যবহার করিতেন না। দেশী দোসুতি অথবা খদ্দরের কাপড় কিনিয়া সেগুলি রং করাইয়া তাহার উপর নিজের হাতে চিত্র-শিল্প করিয়া এত সুন্দর পরদা, চেয়ার টেবিলের আবরণ, ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেন যে, সকলেই তাহার প্রশংসা করিত। নিজের বাড়ীর আসবাব-সরঞ্জাম ইত্যাদির জন্য তিনি কথনো বিদেশী জিনিস কিনিতেন না। বাঁকুড়ায় থাকা কালীন সেই জেলার পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের মধ্যে চরকার প্রচলন করিবার চেষ্টায় তিনি সেখানকার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

তাঁহার বিদেশী বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহার গভীর স্বদেশ-প্রাণতার কথা জানিতেন ও তাহার জন্য তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি বলিতেন, "আমি প্রথম প্রথম ভাবিতাম যে আমাদের দেশের দুঃখের জন্য বিদেশীরাই দায়ী, কিন্তু যত দেখিতেছি ও ভাবিতেছি ততই বুঝিতেছি যে আমাদের দুঃখের জন্য প্রধানতঃ দায়ী আমরা নিজে। আমরা যদি নিজে মানুষ হইতে চেষ্টা করি তবে আমাদের দুঃখ আপনা হইতে দূর হইবে। তিনটী জিনিস আমাদের দরকার। প্রথমতঃ শিক্ষা—আমরা পরকে শিক্ষা দিতে ত সাহায্য করিই না, এমন কি যাঁহাদের ছেলেমেয়েদের পড়াইবার পয়সা আছে, তাঁহারাও ছেলেমেয়ে বিশেষতঃ মেয়েদের স্কুলে পাঠাইতে ও শিক্ষা দিতে চান না। এ দোষ আমাদের দূর করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ—আমাদের দেশে ঘরে ঘরে সমাজ-সেবার

জীবন্ত আদর্শ জাগাইয়া তুলিতে হইবে। আমরা ভাবি যে পারিবারিক স্বার্থের কাজের সুবিধা করিতে পারিলেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গেল; কিন্তু তা নয়। প্রত্যেক পুরুষ ও মেয়েকে পারিবারিক স্বার্থ ও স্বাচ্ছন্দ্যের কাজ করার পর প্রতিদিন সমাজ ও দেশের জন্য কিছু কাজ করিতে হইবে। আর আমাদের তৃতীয় দোষ—আমাদের মধ্যে একের অন্যের প্রতি হিংসা-দ্বেষের ভাব বড় বেশী। অন্য কোন জাতির মধ্যে এরকম দেখা যায় না। অন্ততঃ তাহাদের নিজেদের মধ্যে হাজার ঝগড়া-বিবাদ থাকিলেও সাধারণের কাজে, সমাজের কাজে তাহারা সে সব ঝগড়া-হিংসা ভুলিয়া গিয়া এক জোট হইয়া কাজ করে, ও একজন বড় হইলে বা ভাল কাজ করিলে অন্যেরা হিংসা করে না। আমাদের মধ্যে সেই পরস্পর ভ্রাতা-ভগিনী ভাব ও সদ্ভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে। ঘরে-বাইরে শিক্ষা-বিস্তার, সমাজ-সেবা ও সদ্ভাব-স্থাপন এই তিনটি উদ্দেশ্য সাধনকল্পে দেশের প্রত্যেক স্ত্রী এবং প্রত্যেক পুরুষকে রোজ কিছু না কিছু খাটিতেই হইবে।"

কৌন্সিলের বা মিউনিসিপালিটি ইত্যাদির জন্য মেয়েদের ভোট্ দিবার অধিকার লাভ বিষয়ে তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। তিনি বলিতেন—"আমাদের দেশের মেয়েদের এখন যে রকম অবস্থা তাহাতে এ সব ভোট্ ব্যাপারের হুজুগে লিপ্ত না হইয়া শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতির যে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে তাহাতেই ব্যাপৃত হওয়া প্রয়োজন।"

সরোজনলিনী কখনো স্কুলে পড়েন নাই বলিয়া প্রায়ই আক্ষেপ করিতেন ও বলিতেন, "স্কুলের জীবন বড় সুন্দর ও আনন্দপূর্ণ; যাহাতে দেশের প্রত্যেক বালিকা স্কুলে পড়িবার সুযোগ পায় তাহা করা আমাদের কর্ত্তব্য।"

এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তিনি সর্ব্বদা আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তিনি আমার সঙ্গে মফঃস্বলে যেখানে যাইতেন সেখানকার পুরুষ ও মহিলারা তাঁহাকে অভিনন্দন দিয়া অভ্যর্থনা করিতেন। তাহার উত্তরে তিনি বলিতেন,—"আমাকে অভ্যর্থনা বা অভিনন্দন না করিয়া আপনারা আপনাদের গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করুন ও বালিকা-বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করুন; এবং যাহাতে প্রত্যেক মেয়ে অন্ততঃ ১৪।১৫ বৎসর পর্য্যন্ত স্কুলে পড়িতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করুন; তাহা হইলেই আমি সুখী হইব। আবার যখন আপনাদের গ্রামে আসিব তখন যেন দেখিতে পাই যে আপনারা আমার অনুরোধটি কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন।"

তাঁহার এরূপ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অনেক স্থানে নূতন বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং যাঁহারা গোড়া হিন্দুত্বের ভ্রান্ত খাতিরে মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার বিপক্ষে ছিলেন তাঁহারা তাঁহার অনুরোধে মেয়েদিগকে—এমন কি বিবাহিতা মেয়েদিগকেও স্কুলে পাঠাইয়াছেন।

বালিকা-বিদ্যালয়ের মেয়েরা সরোজনলিনীর চরিত্রের প্রভাব বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিত। আমাদের বীরভূম ছাড়িবার সময় সেখানকার বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রায় প্রত্যেক মেয়ে তাহাদের বালিকা-সুলভ ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষায় এক-একটী প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়স্পর্শী অভিনন্দন নিজেদের হাতে লিখিয়া তাঁহাকে উপহার দিয়াছিল। নমুনা স্বরূপ তাহার দুইটী নিম্নে দেওয়া হইল :—

"নিয়তিদেবীর চক্রে ঘূর্ণিত হইয়া আজ আমরা একটী স্বর্গীয় পদার্থ হারাইতে চলিয়াছি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আসিবে কিন্তু

আমাদের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের, স্বর্গীয় অনন্ত মাধুর্য্যের উজ্জ্বল মণিটি আর ফিরিয়া আসিবে না।

"আমাদের দুঃখ ও সুখ, সন্ধান ও লাভ, মৃত্যু ও অমরত্বের মধ্যে সেই অমূল্য জিনিস আর আসিবে না। আমাদের অদৃষ্ট মন্দ, তাই স্নেহময় ঈশ্বরের কীর্ত্তির চরোমৎকর্ষ, দেবতার ছায়া দেবী-প্রকৃতি একটী হিতাকাঙ্ক্ষিণীকে হারাইতে চলিয়াছি।

"জগৎপিতা পরমেশ্বরের অনন্ত কৃপায়, অনন্ত মহিমায় আমরা এই উচ্চমনা, পরদুঃখ-কাতরা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণীকে পাইয়াছিলাম। এই কল্যাণময়ী দেবী দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে আমাদের মঙ্গল চিন্তা করিতেন। সূর্য্যালোকে জগৎ হাসিবে, চন্দ্রালোকে পৃথিবী উজ্জ্বল হইবে; আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী দেবী আর আসিবেন না। যে কল্যাণময়ী দেবী অন্ধকার গুহা-স্বরূপ আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানপ্রদীপ জ্বালাইবার তরে এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন সেই দয়ার আধার দেবীকে আজ আমরা বিদায় দিতে চলিয়াছি।

"আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, আমাদের উৎসাহ ও কর্ম্মস্পৃহা, আমাদের ভাব ও ধারণা, আমাদের সাধনা ও সিদ্ধির একমাত্র উপায় এই কল্যাণময়ীর মহত্ত্বের পথ অনুসরণ।

"মা! আমাদের স্কুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী,—যেখানেই থাক বিস্মৃত হইও না। আশীর্ব্বাদ করিও যেন আমরা তোমার মহিমার পথ অনুসরণকরিতে পারি; এবং তোমার পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিজেকে নিজে ধন্য মনে করিতে পারি।

"হে বিশ্ববিধাতঃ অন্তর্য্যামি মহাপুরুষ, তুমি তোমার করুণার স্নিগ্ধ স্পর্শে আমাদের দৈন্যকে গৌরবময় করিয়া দাও এবং আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষিণীকে অমরত্বের পথে লইয়া যাও।

"হে মঙ্গলময় পরমেশ্বর, তোমার অনুগ্রহে তিনি যেখানেই থাকুন অলক্ষিত-ভাবে আমাদের পথপ্রদর্শক হইয়া যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত্তকে উজ্জ্বল করেন।

"ইতি—

"আপনার বিমল স্নেহপ্রার্থী

"ননীবালা সেন।"

"মহামহিমার্ণবা,

"মা, আপনি চলিয়া যাইতেছেন এজন্য বড় দুঃখিত হইলাম। আপনি আমাদের যে উপকার করিয়াছেন আর ভালবাসিয়াছেন তাহা জীবনে ভুলিব না। আপনি কাছে থাকিয়া যে রকম ভালবাসিয়াছেন দূর হইতেও দয়া করিয়া ভালবাসিবেন। আশা করি আপনি আবার ফিরিয়া আসিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আপনাকে আমরা স্নেহময়ী জননী বলিয়া জানি; কিন্তু আজি হইতে আমরা মাতৃহীনা হইলাম। আপনার স্নেহ, আপনার উপকার দিবানিশি স্মরণ করিব; অনুগ্রহ করিয়া অধীনা কন্যাদিগকে মনে রাখিবেন। আপনাকে বিদায় দিয়া বড় দুঃখিত হইলাম।

"বিনয়াম্বিতা

"কুমারী জয়ন্তী রায়।"

হিন্দুবিধবাদের দুরবস্থা দেখিয়া সরোজনলিনীর প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছিল। বিধবাদের যাহাতে পরের গলগ্রহ হইয়া বা দাসীত্ব করিয়া না থাকিতে হয় সেজন্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে বিধবাদের অর্থকরী শিল্পশিক্ষার জন্য প্রতি সহরে ও গ্রামে শিল্পশিক্ষা-কেন্দ্র খোলা হয়। তাঁহার

বিশ্বাস ছিল, বিধবারা এই সকল কেন্দ্রে শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে আত্মমর্য্যাদা বজায় রাখিয়া জীবন যাপন করিতে পারিবে।

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার মতের একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি বলিতেন,—"যে সকল বিধবা পুনরায় বিবাহ করিতে চাহেন তাঁহারা বিবাহ করুন; কিন্তু হিন্দুনারী বিবাহবন্ধনকে যে রকম পবিত্র আদর্শে দেখিয়া থাকে, তাহাতে আমার বিশ্বাস, যেসকল হিন্দুবিধবা স্বামীকে একবার ভালবাসিবার সুযোগ পাইয়াছে, তাহারা কখনই আবার বিবাহ করিতে রাজী হইবে না বা চাহিবে না। তবে বালবিধবাদের কথা স্বতন্ত্র। যাহাতে কোন মেয়ে বালবিধবা না হইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা কবিতে হইবে। তাহা করিবার একমাত্র উপায়,—১৬।১৭ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কোন মেয়ের বিবাহ না দেওয়া। প্রত্যেক বাঙ্গালী পিতামাতা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হউন যে ১৬।১৭ বৎসর বয়সের আগে মেয়ের বিবাহ কোন ক্রমেও দিবেন না; তাহা হইলেই বিধবা-বিবাহের জন্য এতটা হুজুগের আর প্রয়োজন হইবে না। বিবাহের পূর্ব্বে প্রত্যেক মেয়েকে কিছু না কিছু শিল্পশিক্ষা দেওয়া একান্ত উচিত। ইহাতে মেয়েদের বিবাহ না হইলে অথবা দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাহারা বিধবা হইলেও পরের দাসীত্ব অবলম্বন করিতে বাধ্য না হইয়া নিজের চেষ্টায় জীবিকা-উপার্জ্জন করিতে পারিবে।"

সরোজনলিনী বলিতেন:—"বাঙ্গালী মেয়েদের জীবনের নিরানন্দতার একটা প্রধান কারণ এই যে, তাহারা বালিকাজীবন যে কি জিনিস তাহা জানিবার সুযোগ পায় না। বালিকা-জীবনেই আনন্দের পূর্ণ বিকাশ হয়। এই বালিকা-জীবন শৈশবকালের শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া যৌবনের পূর্ণ-বিকাশের আরম্ভ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। অর্থাৎ ৮।১০ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮।১৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সময়টাই বালিকা-জীবন। অন্যান্য দেশে

মেয়েদের ২০।২২ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ হয় না ; সুতরাং তাহারা পূর্ণ-শিক্ষার সুযোগ ত পায়ই, তার সঙ্গে বালিকাজীবনের আনন্দ সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করে। তাহাতে অন্যান্য বালিকাদের সঙ্গে খেলাধূলায় মেলামেশায় তাহাদের চরিত্রে আনন্দের পূর্ণবিকাশ হয়, শরীরের শক্তিও স্ফূর্ত্তি পায়। আমাদের দেশে কিন্তু মেয়েরা শৈশবের পরেই বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মাতৃত্বে পদার্পণ করে। বালিকাজীবন যে কি তাহা তাহাদের জানিবার সুযোগই হয় না ; তার আনন্দের সুযোগ, তার শিক্ষালাভের সুযোগ, তার শারীরিক শক্তিসঞ্চয়ের সুযোগ কিছুই আসে না। যতদিন না এই সকল বিষয়ে আমরা দৃষ্টি দিতে শিখিব ততদিন এদেশের মেয়েরা পূর্ণবিকাশ লাভের সুযোগ পাইবে না ; ইহাতে দেশ পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেই। সুতরাং মেয়েদের বিবাহ যাহাতে বালিকা বয়সে অর্থাৎ অন্ততঃ ১৮।১৯ বৎসর বয়সের আগে না হয় তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।”

সরোজনলিনী স্ত্রীলোকদের অবরোধ-প্রথার, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার ঘোর বিরোধী ছিলেন, এবং যখন যেখানে যাইতেন পুরুষদের ও মেয়েদের সঙ্গে তিনি এসব বিষয় লইয়া বন্ধুভাবে আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অনেক বন্ধু পূর্ণবয়স পর্য্যন্ত এবং শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত মেয়েদের বিবাহ স্থগিত রাখিয়াছেন। তিনি যেখানে গিয়াছেন তাঁহার সহিত এক সঙ্গে বসিয়া সকল জাতির গোঁড়া হিন্দুপরিবারের মেয়েরা অবাধে খাইয়াছেন ও তাঁহার অকৃত্রিম সরলতার টানে অনেক গোঁড়া হিন্দু পরিবারের অন্তঃপুরের মেয়েরা—যাঁহারা আগে কখনো কাহারো বাড়ীতে যান নাই, আমাদের বাড়ীতে বা টাউনহলে মহিলা-সমিতির সভায় যোগ দিতে

আসিয়াছেন, অথবা হাসপাতালে রোগীদের শুশ্রূষার বন্দোবস্ত ইত্যাদি পরিদর্শন করিতে তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন, এমন কি অনেকে পায়ে হাঁটিয়াও গিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই সকল পরিবারের পুরুষেরা সরোজনলিনীর অকৃত্রিম সরলতার টানে এসব কাজে বাধা দেন নাই বরং মহিলাদিগকে উৎসাহ দিয়া পাঠাইয়াছেন। অনেক মুসলমান ভদ্রপরিবারের অন্তঃপুর-মহিলারাও তাঁহার প্রেমের আকর্ষণে বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন।

আমার একটি মারোয়াড়ী বন্ধু বলিতেন:—"আমার স্ত্রী কখনও কোন নব্যসম্প্রদায়ের নারীদের সঙ্গে মিশিতে পছন্দ করেন না। কিন্তু আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একবার মাত্র আলাপ করার পর তাঁহার মত বদলাইয়া গিয়াছে এবং তিনি তাঁহার সঙ্গে আবার বিশেষভাবে আলাপ-পরিচয়ের জন্য উৎসুক হইয়া পড়িয়াছেন।"

জাপান ও ইউরোপে ভ্রমণকালে প্রতিদিনই সরোজনলিনী বলিতেন— "আহা, আমাদের দেশের মেয়েরা জগতের অন্যান্য দেশের মেয়েদের চেয়ে শিক্ষায় ও কর্ম্মজীবনে কত পেছিয়ে প'ড়ে আছে তা দেখে আমার কান্না পায়। কবে আমাদের দেশের পুরুষদের এবিষয়ে চেতনা হবে? খালি পুরুষদের শিক্ষায় ও কর্ম্মে দেশ যে এগোবে না তা আমাদের দেশের পুরুষেরা কবে বুঝবে?"

গত বৎসর আমাকে কার্য্যোপলক্ষে বাধ্য হইয়া সরোজনলিনীর আগেই দার্জ্জিলিং আসিতে হইয়াছিল। ছেলের স্কুল তখন ছুটি না হওয়ায় তাঁহাকে কয়েক দিন পরে আসিতে হয়। এই সময় খবরের কাগজে এক প্রবন্ধে পড়িলাম যে, তুরস্কদেশের নারীগণ সামাজিক জীবনে মুক্তি লাভ করিয়া নারীজীবনে আত্মবিকাশের সুযোগ পাইয়াছেন এবং ইহা

তুরস্ক দেশের উন্নতির একটা প্রধান সোপান-স্বরূপ হইয়াছে। এই প্রবন্ধটি খবরের কাগজ হইতে কাটিয়া সরোজনলিনীকে পাঠাইয়াছিলাম। তাহার উত্তরে তিনি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "তুরস্কেরও হবে, সব দেশের হবে। আমরাই শুধু প'ড়ে রইব।"

স্ত্রী-শিক্ষা ও চরিত্র-সম্বন্ধে সরোজনলিনী বলিতেন—"জগতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া বাঁচিতে হইলে আমাদের দেশের নারীদের খালি এক দিক গ্রহণ করিয়া অন্য দিক বর্জ্জন করিলে চলিবে না। যাহারা দেশীয় আচার-ব্যবহার ও প্রাচীন ভারতের নারীচরিত্রের সুন্দর আদশ সম্পূর্ণ ভাবে বর্জ্জন করিয়া বিদেশীয় চরিত্র ও চালচলন গ্রহণ করে তাহারা ত উৎসন্ন যাইবেই; আবার অপরদিকে যাহারা পরদায় লুকাইয়া থাকিয়া জগতের ও সমাজের যাবতীয় ব্যাপার সম্বন্ধে চোখ বন্ধ রাখিয়া খালি গতানুগতকে পূজা করিবে, শিক্ষায় ও কর্ম্মে জগতের সঙ্গে অগ্রসর হইবে না,—যাহারা নিজেদের বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া অন্যান্য দেশের ও জাতির কাছ থেকে নূতন নূতন বিষয় ও জ্ঞান শিক্ষা করিবে না—তাহারাও ডুবিয়া থাকিবে; আর সঙ্গে সঙ্গে দেশকেও ডুবাইয়া রাখিবে। জাপানের পুরুষ ও মেয়েরা এটা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে ও কার্য্যে পরিণত করিতে পারিয়াছে, তাই আজ জাপান এত উঁচুতে আর আমরা এত নীচে।"

তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, এদেশে স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালীর সঙ্গে গৃহস্থালী-বিজ্ঞান ও গৃহশিল্প-শিক্ষা সংযোগের প্রচুর আয়োজন করা দরকার। জাপানে মেয়েদের অনেক স্কুল-কলেজ দেখিয়া তাঁহার এ ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাই তিনি যেখানে যাইতেন সেখানকার বালিকা-স্কুলে স্থানীয় মহিলা-সমিতির তত্ত্বাবধানে রন্ধন-

বিজ্ঞান, সেলাইয়ের কাজ, কাপড় কাটিয়া পারিবারিক লোকের ব্যবহারের জন্য জামা ইত্যাদি প্রস্তুত করার কাজ ইত্যাদি শিক্ষা দিবার আয়োজন করিতেন ও মহিলা-সমিতির মেম্বরগণ সমভিব্যাহারে বালিকা-বিদ্যালয়ে গিয়া বিদ্যালয়ের মেয়েদিগকে সেলাই ও রন্ধনবিদ্যা ইত্যাদিতে পরীক্ষা করিতেন ও সমিতি হইতে এই সব বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য মেয়েদিগকে পারিতোষিক প্রদানের ব্যবস্থা করিতেন। তিনি বাঁকুড়ায় থাকা কালীন বয়স্কা অন্তঃপুর-মহিলাদিগকে এই সকল গৃহশিল্প শিক্ষা দিবার জন্য একটী শিল্পশিক্ষার কেন্দ্রও স্থাপন করিয়াছিলেন এবং প্রতি অধিবেশনের দিনে কেন্দ্রে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া শিল্পশিক্ষা-কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন।

এক সময়ে বাঁকুড়ার হাসপাতালে গিয়া সরোজনলিনী দেখিলেন রোগীদের জন্য থালা বাসন ইত্যাদি কিছুই ছিল না। এসব জিনিস খরিদ করিবার জন্য টাকাও হাসপাতাল কমিটি দিতে পারিতেন না। রোগীরা খাবার এবং পথ্যাদি পর্য্যন্ত শালপাতার ঠোঙ্গায় খাইতেছিল। ইহা দেখিয়া তাঁহার কোমল প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি মহিলা-সমিতির দ্বারা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া পুরুষ ও মেয়েদের দুই হাসপাতালেই পিতলের থালা, বাটী, গেলাস ইত্যাদি খরিদ করিয়া উপহার দিলেন। রোগীদের জন্য এই সব বাসন বাস্তবিক ব্যবহার হইতেছে কি না এবং মহিলা-সমিতি প্রদত্ত টাকা দ্বারা রোগীদিগকে দুধ, মাছ ইত্যাদি খাইতে দেওয়া হইতেছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য মহিলা-সমিতির কতিপয় মেম্বরগণ সমভিব্যাহারে তিনি মাঝে মাঝে হঠাৎ রোগীদের খাবার সময় হাসপাতাল পরিদর্শন করিতে যাইতেন।

আমি ছাত্রজীবনে স্বর্গীয় সার্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যে

সব চমৎকার বক্তৃতা শুনিয়াছি তাহার কথা শুনিয়া তিনি সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গালী সৈন্যদল সংগ্রহের জন্য যখন বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন আমরা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বীরভূমে আহ্বান করি। সেখানে তিনি একটী মহতী সভায় যে ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন সরোজনলিনী তাহা শুনিতে যান ও তাহা শুনিয়া যার পর নাই আনন্দলাভ করেন।

বীরভূমে বাঙ্গালী সৈন্য-সংগ্রহে সরোজনলিনী বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। যেখানে সৈন্য-সংগ্রহের বক্তৃতায় আমি যাইতাম তিনিও আমার সঙ্গে সেখানে যাইতেন। যে সব যুবক বীরভূম হইতে সৈন্যদলে যোগ দিয়াছিল তাহাদিগকে বিদায় দিতে তিনি ষ্টেসনে গিয়া তাহাদের গলায় মালা পরাইয়া তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। একদল বাঙ্গালী সৈন্য যখন সৈন্যসংগ্রহার্থে বীরভূমে আসেন তখন তিনি মহিলা-সমিতি হইতে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন ও সমিতির অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া নিজে রান্না করিয়া নিজের হাতে পরিবেশন করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইয়াছিলেন। সৈন্যদের ব্যবহারার্থে নানাপ্রকার কাপড় সেলাই করিয়া ও দাঁতন, মিষ্টি, চাট্‌নি, খবরের কাগজ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য তাহাদের জন্য প্রতিমাসে মহিলাদের দ্বারা সংগ্রহ করিয়া মেসোপটেমিয়ায় পাঠাইয়াছিলেন।

মফঃস্বলে যখনই কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনী হইত তখন মহিলাদিগের প্রদর্শনী দেখিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি প্রদর্শনীক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া মহিলাদিগকে অক্লান্তভাবে সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া শিক্ষা দিতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার টাউনহলে যে শিশু-মঙ্গল

প্রদর্শনী হয় তাহাতে সরোজনলিনী মাতৃমঙ্গল বিভাগে সমস্ত দিন উপস্থিত থাকিয়া অন্তঃপুর-মহিলাদিগকে প্রদর্শনীর সব দ্রষ্টব্য জিনিস তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় সৈন্যদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য টাকা তুলিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতার বাঙ্গালী মহিলারা একটা মূক অভিনয় করিয়াছিলেন ; সেই অভিনয়ে ভিন্ন ভিন্ন নারীরা ভারতমাতা ও তাঁহার নানা প্রদেশীয় কন্যা সাজিয়াছিলেন। সবোজনলিনী এই অভিনয়ে আদর্শ বাঙ্গালী নারী সাজেন। এই সাজে তাঁহাকে বড় সুন্দর মানাইয়াছিল।



বীরভূম মহিলা-সমিতির সদস্য-গণ

(সরোজ-নলিনী মহিলা-মিলন-মন্দির-প্রাঙ্গনে)

৮৩ পৃঃ

সমাজ-সেবা

সরোজনলিনী তাঁহার জীবনে দুইটি সেবাব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে প্রধান ব্রত ছিল স্বামীপুত্র-সেবা ও গৃহস্থালীর কাজ। কোন দিন কোন বিশেষ কারণেও এই প্রধান ব্রতের উপেক্ষা বিন্দুমাত্রও করেন নাই। ইহার পর দ্বিতীয় ব্রত ছিল দেশের সেবা, বিশেষতঃ বঙ্গনারীর সেবা— বঙ্গদেশের মেয়েদের শিক্ষার ও জাগরণের কাজ। দেশের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার মন নিরন্তর কাঁদিত। আমি যখন যেখানে কার্য্যোপলক্ষে পুরুষদের সঙ্গে মিশিতাম, তিনি তখন সেখানে অন্তঃপুরে মেয়েদের সঙ্গে মিশিতেন। আমি মিশিতাম আইনের সম্বন্ধে—রাজকর্ম্মচারী-রূপে। তিনি মিশিতেন অন্তরের প্রেমের সম্বন্ধে—সমবেদনায় ব্যাকুলপ্রাণ ভগিনীরূপে। সুতরাং আমার অপেক্ষাও দেশের প্রকৃত সমস্যা তিনি বেশী ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন। মেয়েরা তাঁহার সরলতায়, তাঁহার অকৃত্রিম প্রেমের আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অকৃত্রিম বিশ্বাস করিতেন। যে সব মেয়ে কখনো অন্তঃপুরের বাহির হন নাই তাঁহারা তাঁহার আদর্শে ও উৎসাহে অকাতরে টাউন হলে (Town Hall) মহিলা-অনুষ্ঠানের সভা-সমিতিতে আসিতেন ও তাঁহার সঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া রোগীদিগকে দেখিবার জন্য ও তাহাদিগের ব্যবহারের জন্য বাসন, থালা ইত্যাদি দান করিবার জন্য হাসপাতাল পরিদর্শনে যাইতেন। মফঃস্বলের পরদার ভিতরের হিন্দু-মুসলমান মহিলাদের সরলতা, অহঙ্কারহীনতা ও অকপটতার তিনি যার পর নাই প্রশংসা করিতেন, এবং ইহাঁদের মনের উপরে তাঁহার নিজের স্বভাবের ছাপ তিনি সহজেই দিতে পারিতেন ও তাঁহারাও আগ্রহের সহিত তাহা লইতেন।

আমি জানি, মফঃস্বলবাসী অনেক পরিবারের স্ত্রী পুরুষের জীবনের ধারা তাঁহার প্রভাবে, তাঁহার আদর্শে ও তাঁহার প্রেমের টানে সামাজিক কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া সত্যের দিকে, আনন্দের দিকে, মুক্তির দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, দেশকে উন্নত করিতে হইলে মেয়েদের জাগরণই প্রথম এবং প্রধান কাজ। আর তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এই জাগরণে পুরুষেরা বাধা দিতে পারে বটে, কিন্তু মেয়েরা নিজে চেষ্টা না করিলে এই জাগরণ খালি পুরুষের বক্তৃতা বা কর্ম্ম দ্বারা সাধিত হইবে না। তাই তিনি মেয়েদিগকেই এই জাগরণের জন্য যুক্ত চেষ্টায় মিলিত করিয়া উদ্বুদ্ধ করিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। দেশের নারীজাতির সুপ্তশক্তিকে জাগ্রত ও যুক্ত করিয়া কর্ম্মে নিয়োজিত করিতে পারিলে দেশে যে কি এক মহীয়সী শক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে, তিনি তাহারই মোহিনী ছবি কল্পনার চক্ষে দিনরাত্রি দেখিতেন। বঙ্গের অন্তঃপুরের হিন্দু-মুসলমান রমণী যতই নিরক্ষর হউন না কেন, তাঁহাদের হৃদয়ের সরলতা ও চরিত্রের সত্যতার এবং কর্ম্মক্ষমতার উপর তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি তাঁহাদিগকে মহিলা-সমিতিতে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া নিজেদের মধ্যে পরস্পর পরিচয়, মেলামেশা ও ভাবের আদান-প্রদান দ্বারা শিক্ষা ও চরিত্রগঠন ও নিজেদের পারিবারিক ও সামাজিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও শিল্প বিষয়ক সর্ব্ববিধ উন্নতি ও মুক্তিলাভ করিবার জন্য নিয়োজিত করিতে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি পাবনায় বীরভূমে, রামপুর হাটে, বাঁকুড়ায়, দার্জ্জিলিংএ যেখানে যাইতেন সেখানেই মহিলাসমিতি স্থাপিত করিয়া মহিলাদিগকে নানাবিধ উপায়ে জাগ্রত

ও অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্টা করিতেন। অনেক হিন্দু-মুসলমান ভদ্রলোকেরা তাঁহাকে যখন বলিতেন, "আমাদের মেয়েরা এত অশিক্ষিতা ও লজ্জাশীলা যে তাহারা সভা-সমিতিতে যোগ দিতে বা আপনার সঙ্গে কথা বলিতে পারিবে কি?" তখন তিনি বলিতেন--"বাঙ্গালী মেয়ে নিরক্ষর হ'তে পারে কিন্তু কখনো অশিক্ষিতা নয়। তাহারা কথা বলিতে পারে না এটা আপনা-দের ভুল ধারণা। তাঁহাদের সুযোগ দিন, অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে একত্র মেলামেশায় এবং দেশের ও সমাজের কাজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিতে দিন, দেখিবেন তাঁহাদের কথা বালবার অভাব হইবে না। মুখে কথা ফুটিবে, এবং কর্ম্মের সুপ্তশক্তি তাঁহাদের মধ্যে পুনরায় জাগ্রত হইয়া পরিবারের ও দেশের অসীম কল্যাণ সাধন করিবে।"

বীরভূমে তাঁহার মহিলা-অনুষ্ঠানগুলির কৃতিত্বের জন্য তিনি সম্রাট কর্তৃক ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে, এম, বি, ই ("ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-মণ্ডলীর সদস্য") উপাধিতে ভূষিতা হন। কুচবিহারের মহারাণী শ্রীযুক্তা সুনীতি দেবী ছাড়া ভারতরমণীব পক্ষে বোধ হয় রাজসম্মান-সূচক উপাধি লাভ এই প্রথম। ইহা ব্যতীত বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে সৈন্যদলের জন্য—বিশেষতঃ বাঙ্গালী সৈন্যদলের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য—অর্থ ও নানা প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বীরভূমের মহিলাগণের দ্বারা সংগ্রহ ও প্রস্তুত করার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া ইংলণ্ডের "রেড ক্রস্ সোসাইটি" হইতে সার্টিফিকেট ও উপহার ইত্যাদি পাইয়াছিলেন। কিন্তু উপাধির রৌপ্যপদক পরিতে অথবা নামের পরে উপাধি লিখিতে সরোজনলিনী মোটেই পছন্দ করিতেন না; তিনি বলিতেন, "উপাধি লইয়া আমি কি করিব? আমি খালি চাই দেশের সেবা ও দেশের নারীজাতির উন্নতির সহায়তা কবিবার সুযোগ।"

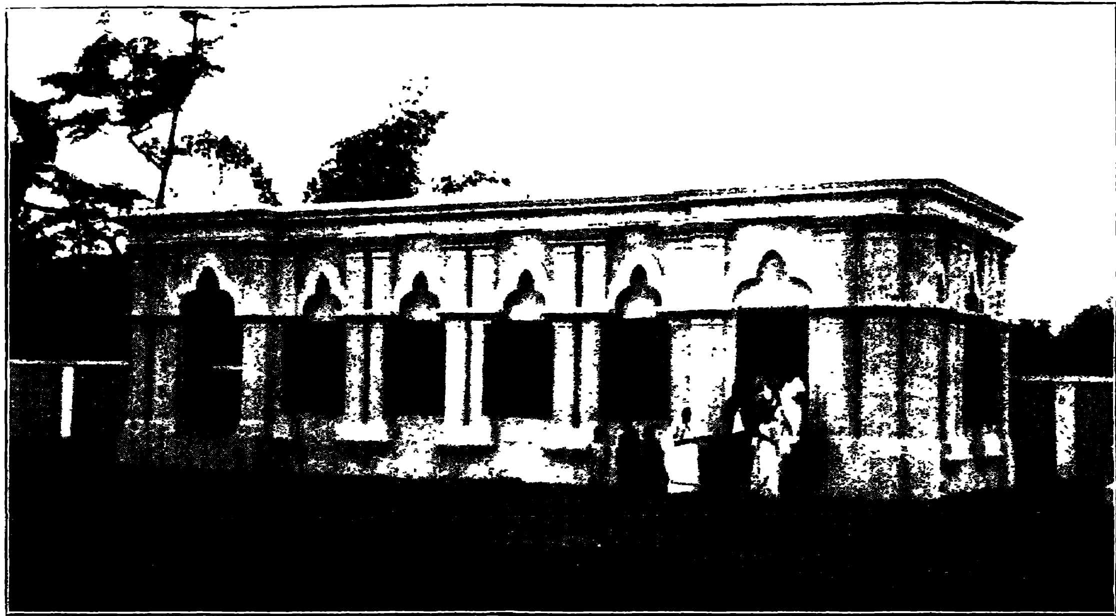
বীরভুমের নেত্রীস্থানীয়া মহিলাগণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ সিউড়িতে তাঁহার নামে প্রায় তিন হাজার টাকা ব্যয়ে "সরোজনলিনী মহিলা-মিলন মন্দির" নামক মহিলা-সমিতির জন্য একটি সুন্দর মিলনাগার নির্ম্মাণ করিয়াছেন।*

চারি বৎসর পূর্ব্বে সরোজনলিনী যখন আমার সঙ্গে জাপান ও ইউরোপ ভ্রমণ † করিতে গিয়াছিলেন তখন প্রতিদিন আহার এবং বিশ্রামের ব্যাঘাত করিয়াও সে সব দেশের মেয়েদের অসংখ্য বিদ্যালয় ও মেয়েদের উন্নতির সহায়ক প্রতিষ্ঠান ও শিশুমণ্ডল প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন। যাহাতে দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেশের মেয়েদের উন্নতিতে সাহায্য করিতে পারেন তাহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। যাহা যাহা দেখিতেন তাহা নিজের দিন-লিপিতে সযত্নে লিখিয়া রাখিতেন। আমাদের বিলাতে অবস্থানকালে এই সব বিষয়ের অনুসন্ধানে তিনি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তাঁহাকে ছোট বোনের মত স্নেহ ও পরম বন্ধুর মত শ্রদ্ধা করিতেন এবং লণ্ডনে তাঁহাকে অনেক মহিলা-প্রতিষ্ঠান দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন।

জাপান-ভ্রমণের সময় টোকিওতে ব্রিটিশ এম্ব্যাসেডারের বাড়ীতে ও জাপানের মার্কুইস ওকুমা প্রমুখ নেতৃদের বাড়ীতে এবং বিলাত-ভ্রমণের সময় লণ্ডনের লর্ড মেয়রের ম্যান্‌সন্ হাউস্ প্রাসাদ প্রভৃতি স্থানে আমন্ত্রিত হইয়া তিনি সেখানকার আনন্দ-উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

* বীরভূম মহিলা-সমিতি তাঁহার পরলোকগমনে শোকপ্রকাশার্থ সেখানকার বর্ত্তমান কালেক্টর-পত্নী শ্রীমতী কুইনটনের সভানেতৃত্বে এক সভা আহ্বান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহার একটি বৃহৎ তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া "সরোজনলিনী মহিলা-মিলনমন্দিরে" রাখা হইবে।

† সরোজনলিনীর লিখিত 'জাপান ও ইংলণ্ড ভ্রমণকাহিনী' শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।



সরোজ-নলিনী মহিলা-মিলন-মন্দির, সিউড়ি

৮৬ পৃঃ

ইহা ছাড়া এই সব দেশের সমাজের উচ্চতম স্তরে অবস্থিত নরনারীর অনেক আনন্দ সম্মিলনীতেও তিনি যোগ দিয়াছিলেন ; এমন কি লণ্ডনে সম্রাটের বাকিংহাম প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইয়া সম্রাট, সম্রাজ্ঞী ও প্রিন্স্ অফ্ ওয়েল্সের সঙ্গে সহাস্যালাপ করিবার সুযোগ এবং সৌভাগ্যও তাঁহার হইয়াছিল ; কিন্তু এগুলিতে তাঁহার প্রাণ সম্যক্ সন্তুষ্টিলাভ কবিত না। তাঁহার দিনরাত উদ্দেশ্য ও চেষ্টা ছিল, সে সব দেশের স্ত্রীজাতির উন্নতির প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ করিয়া দেখা। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বাকুড়ায় যে মহিলা-সমিতি ও তৎসম্পর্কীয় সদনুষ্ঠান স্থাপিত কবিয়াছিলেন তাহাদের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা, হাসপাতালে রোগীদের সাহায্য ও শুশ্রূষা, ধাত্রীশিক্ষা, শিশুমঙ্গল ইত্যাদি সৎকার্য্য কি রকম সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইতেছে তাহা অনেকেরই জানা আছে।

গরীবের দুঃখে তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদা বিচলিত হইত। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বৃষ্টি না হওয়ায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। বীরভূমের অন্নক্লিষ্ট নরনারীদিগের দুঃখ লাঘবের জন্য সরোজ-নলিনী মহিলা-সমিতির পক্ষ হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বাজার হইতে সস্তা দরে জেলার নানা জায়গায় চাউল বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।*

সংগঠনী শক্তি এবং কার্য্যকরী শক্তি উভয়ই তাঁহাতে অসাধারণভাবে বর্ত্তমান ছিল।

সরোজনলিনীর এম, বি, ই, উপাধি প্রাপ্তির পরে সুলতানপুর গ্রামে বীরভূম মহিলা-সমিতির যে অধিবেশন হয় তাহাতে তাঁহাকে নিম্নলিখিত অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল :—

* এতৎসম্পর্কে তিনি সাধারণের কাছে যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহা পরিশিষ্টে ছাপান হইল।

"মহামহিমান্বিতা মাননীয়া

শ্রীযুক্ত সরোজনলিনী দত্ত এম, বি, ই, মহোদয়ার করকমলে।

"মহাশয়া,

'গুণগ্রাহী ব্রিটিশ-সম্রাট প্রদত্ত আপনার উপাধিলাভে বীরভূমবাসিনী মহিলাবৃন্দ আমরা আজ নারীত্বের গর্ব্বে গৌরবান্বিতা ও পরম পুলকিতা। আজ হৃদয়ের প্রতি শিরা-উপশিরা সেই পুলকস্পন্দন অনুভব করিয়া বীণার সুরে স্বতঃই বাজিয়া উঠিতেছে। সে স্বরের তান, লহরী, মূর্চ্ছনা ও ঝঙ্কার আজ বীরভূমের যাবতীয় ললনার হৃদয়কন্দরে আপনি বাজিয়া উঠিয়া তাহাদিগকে আনন্দতুফানে উদ্বেলিত করিতেছে। যে গরীয়সী মহিলার কৃপায় আজ আমাদের প্রাণ কর্ত্তব্যের তাড়নায় তাড়িত, হৃদয় পুণ্যালোকে উদ্ভাসিত এবং জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত, সেই মহীয়সী, কর্ত্তব্য-পরায়ণা আদর্শস্থানীয়া দেবীপ্রতিমা, বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের যোগ্যতমা সহধর্ম্মিণী ও ধর্ম্মানুরাগিণী আপনি; আপনার উদ্দেশে আমাদের হৃদয়ের স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধা-চন্দন বিলেপিত যে কুসুমার্ঘ্য প্রদত্ত হইতেছে, বিশেষ ভরসা অযোগ্যাদের সেই ভক্তিকুসুমাঞ্জলি-গ্রহণে তাহাদিগকে চিরবাধিত এবং এই আনন্দের দিনে পূর্ণানন্দ প্রদান করিবেন। আজ মত্ত হরষে প্রাণের শতবাসনা সহস্র আরাধনা, হৃদয়ের তীব্র কামনা, তীক্ষ্ণ উন্মাদনা, আপনার পানে লক্ষমুখী হইয়া প্রবাহিত; আর প্রদীপ্ত, মুখরিত এই প্রাণ আপনারই কল্যাণ-কামনায় ভগবানের পায়ে লুণ্ঠিত। আন্তরিক ভজনা কখন ব্যর্থ হয় না; আর বিফলে যায় না কখনও বিশ্বস্ত আরাধনা। তাই আজ বলিবার সাহস, অয়ি রাজসম্মান-ভূষিতা বিদুষী! বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গলময় স্পর্শ অনুক্ষণ আপনাকে বেষ্টন করিয়া রাখিবে এবং জ্ঞানে, গুণে, ধর্ম্মাচরণে, কর্ত্তব্যপালনে,

সুশিক্ষা প্রদানে, নারীসমাজ সংরক্ষণে, অহরহ আপনাকে জাগরিত প্রবুদ্ধ ও নিয়োজিত রাখিবে।

"বিংশ শতাব্দীর বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্র এই ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে ধর্ম্মরক্ষার্থে নিয়োজিত ভারতীয় বীরবৃন্দের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য আপনার ঐকান্তিকী চেষ্টা, অদম্য উৎসাহ এবং বিশ্রামবিহীন উদ্যোগ আমাদের প্রাণে নূতন ভাব সঞ্চার করিয়া বহুকাল-বিস্মৃত কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। এই ভারতবর্ষে আমাদেরই পূর্ব্বগামিনী বীরপ্রসবিনী সীমন্তিনীগণ স্বহস্তে পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্রদিগকে অস্ত্রসস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া রক্ষা-কবচ বাঁধিয়া বিপুল গর্ব্বে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রেরণ করিতেন। হায়! সে দিনের কথা বিস্মৃতি-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিল, কিন্তু আজ আমরা অনুভব করিতেছি যে, ভারতবর্ষের সেই অমরদুর্লভ পূর্ব্বমহিমান্বিত কীর্ত্তি-সমারোহ আপনার হৃদয়ালোকে উদ্ভাসিত ও জীবনোচ্ছ্বাসে স্পন্দিত। আর সেই সঙ্গে আমাদেরও জীবনযাত্রার দুর্গম অন্ধকার পথ আপনার পুণ্যালোকে আলোকিত ও সুপ্রশস্ত; প্রাণহীন দেহ, চেতনাবিহীন অন্তর, আপনার উচ্ছ্বসিত প্রাণের স্পন্দনে জীবিত, আলোড়িত ও প্রভাবিত।

"অলৌকিক মনীষাবলে, আশ্চর্য্য কার্য্যকৌশলে, স্নেহাভিষিক্ত ব্যবহারে, করুণ কোমল হৃদ্যতায়, আপনি নারীজগৎকে নূতন জীবনে উজ্জীবিত করিতেছেন; এবং কি এক অত্যাশ্চর্য্য মহামন্ত্রবলে, আয়াস-সাধ্য সাধনার ফলে, অধঃপতিত এই সমাজকে জ্ঞানের দ্বারা প্রবীণ, গুণের দ্বারা নবীন, দানের দ্বারা অদীন, মায়ামমতার দ্বারা ক্লেশহীন, দয়া-দাক্ষিণ্যের দ্বারা দৈন্যহীন, এবং সংশিক্ষায় সমীচীন করিয়া তুলিতেছেন। প্রার্থনা করি, চিরদিন

সেই মঙ্গলময় ধাতার সুবিমল করুণার সম্ভার মস্তকে বহন করিয়া এবং সুখসম্পদ-মর্য্যাদাপূর্ণ দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া নারীজন্ম ধন্য ও সার্থক করুন এবং আজীবন তাঁহারই মহতী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত থাকুন।

"বীরভুম মহিলাসমিতির মহিলাবৃন্দ।"

"৩০শে জৈষ্ঠ, ১৩২৬ সাল।"

আর একটি অভিনন্দনে বীরভুমের মহিলারা বলিয়াছিলেন :—

"হে বীরভূম-নারীজন-হিতৈষিণি মূর্ত্তিমতি কল্যাণময়ি দেবি!

"অজ্ঞান পরহিতসুধারস-বঞ্চিতা অন্তঃপুরবদ্ধা ক্ষুদ্রনারী আমরা, তোমাকে আজ কি বলিয়া অভিনন্দন করিব জানি না। তুমি আমাদের জড়দেহে প্রাণের স্পন্দন আনয়ন করিয়াছ; তুমি আমাদিগকে আপন স্নেহের আকর্ষণে আপনার হ'তে আপন করিয়াছ। কত ত্যাগস্বীকার করিয়া আজ তুমি সাদর আহ্বানে পরস্পর মিলিত হইবার সুবর্ণসুযোগ দান করিয়াছ। তোমার প্রীতিময় ব্যবহারে, তোমার স্মিতোজ্জ্বল বদনের আদর বচনে, তোমার নারীহিত-প্রণোদিত অক্লান্ত পরিশ্রমে, তুমি আজ আমাদিগকে একান্ত আকৃষ্ট ও মোহিত করিয়াছ। তোমার এই পরার্থপরতার মহান্ আদর্শ যেন আমাদের মলিন হৃদয়ে নিয়ত প্রতিফলিত থাকে।

"ধন্য তোমার নারীশক্তি! সার্থক তোমার শিক্ষালাভ! যে শক্তি ও শিক্ষা তুমি এই দীন-হীনাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছ, তোমার সেই মহীয়সী নারীশক্তি সতত জয়যুক্ত হউক; পরম কারুণিক জগদীশ্বরের নিকট আজ আমাদের ইহাই প্রার্থনা।

"আমরা ক্ষুদ্র অন্তঃপুরবাসিনী জ্ঞানহীনা অবলা; এই কল্যাণময়ী



বাঁকুড়া মহিলা-সমিতির সদস্যগণ

৯১ পৃঃ

দেবীকে ধন্যবাদ দিবার শক্তি কি আমাদের আছে? কেবল মাত্র কৃতজ্ঞ হৃদয়ের অন্তঃস্তল নিহিত ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। মঙ্গলময়ি! আমাদের আকুল প্রাণের ভক্তি-পুষ্পরাশি গ্রহণ করিয়া আজিকার এই শুভমিলন সার্থক কর।

"বীরভূমবাসিনী মহিলাবৃন্দ।"

বাকুড়া মহিলা-সমিতির সভ্যেরা লিখিয়াছিলেন :---

"আপনারে তুমি ফেলেছ মিশায়ে সবার মর্ম্মে মর্ম্মে
আপনারে তুমি দিয়েছ বিলায়ে দেশের সকল কর্ম্মে।"

আমরা বাঁকুড়া ছাড়িয়া আসার সময় বাঁকুড়া মহিলা-সমিতির পক্ষ হইতে সরোজনলিনীকে যে অভিনন্দন দেওয়া হয় তাহাতে লেখা ছিল :—

"ঘোম্‌টার আড়ালে অন্তঃপুরের গরাদ ভাঙ্গিয়া স্বভাব প্রকৃতির লীলা-মাধুরী আরো ফুটাইয়া তুলিবার ও অবাধ মিলনের পথ চিরমুক্ত করিবার জন্য নীতির জয়ডঙ্কা বাজাইতে অবিচলিত স্থিরসঙ্কল্প যিনি---আজ তাঁহারই বিদায়!

"তত্ত্বপ্রকাশের জন্য প্রেমের কুরূপকে সুরূপ করিয়া নারীদের হৃদয়-কালিমা মুছাইয়া দিয়া সুপ্তনারীকে হৃদয়ের মহত্ত্ব দেখাইয়া জাগাইয়া তুলিতে ও আশ্রয়রূপে নিজের অন্তরের মণিকোঠার বিপুল স্থান ছাড়িয়া দিতে যাঁহার কৃপণতা বা সঙ্কোচ ছিল না—ঘুমন্ত সৌন্দর্য্যকে বিকসিত করিয়া আমাদের হৃদয়-রতনমণিকেও সেইরূপ ভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য যাঁহার প্রাণের একান্ত উদ্যম—আজ তাঁহারই বিদায়!

"যাঁহার রূপ কেবল অনুরাগের সৃষ্টি লালসার উত্তাপে জীবন ঝল্‌সাইয়া দেয় না—মন্দাকিনী প্রবাহের মত কেবল পবিত্র, কেবল স্নিগ্ধ শান্ত সরলতাময়—সেই মঙ্গলময়ী শান্তিময়ীর আজ বিদায়!

"আমাদের স্বাস্থ্যহীন নীতিহীন মৃত সমাজ যাঁহার কারণে পুনর্জ্জীবনের সাড়া পাইয়াছিল—আজ তাঁহারই বিদায়!"

মহিলা-অনুষ্ঠান অথবা মহিলা-জাগরণ সম্পর্কিত সর্ব্বপ্রকার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করিবার জন্য সরোজনলিনীর প্রাণ সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকিত। কোনদিন স্বামীপুত্রের এবং ঘরকন্নার কাজ ছাড়া দেশের জন্য অন্ততঃ কিছু কাজ না করিতে পারিলে তিনি সে দিনটা সম্পূর্ণ সার্থক বলিয়া মনে করিতেন না। বিগত বারাসত প্রদর্শনীতে এক মহিলা-সম্মিলনী করিয়া বারাসতের নেতারা তাঁহাকে তাহার সভানেত্রী করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি এই সম্মিলনীতে গিয়া বারাসতের মহিলাদিগের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া সেখানে একটি মহিলা-সমিতি স্থাপনের জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়া ছিলেন; কিন্তু প্রদর্শনীর পূর্ব্বেই শরীর অসুস্থ হইয়া শেষ-পীড়ায় শয্যাগত হওয়ার পর এই সম্মিলনীতে গিয়া নিজে সম্মিলিত মহিলাদিগের জাগরণের কাজ করিতে পারিবেন না বলিয়া রোগশয্যায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—"আহা আমার বড় দুর্ভাগ্য—মেয়েদের জাগরণের এমন সুযোগ হারাইলাম।"

সমাজসেবার সামনে সাধারণ সামাজিক জীবনের আড়ম্বর ও আমোদ-প্রমোদ তাঁহার কাছে নিতান্ত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ লাগিত। দার্জ্জিলিং-এর মহিলা-শিল্প কেন্দ্র তাঁহার পরামর্শে ও নেতৃত্বে মহিলা-সমিতিতে পরিণত হয়। গত পূজার ছুটিতে তিনি যখন দার্জ্জিলিং ছিলেন তখন স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ বেণ্টলি তাঁহার অনুরোধে একজন বক্তা ডাক্তার শ্রীযুক্ত মুরারীমোহন বসুকে ছায়াচিত্র সাহায্যে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য দার্জ্জিলিং পাঠান। সেখানে বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলীর বিখ্যাত বক্তা

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসুও ছিলেন। সরোজনলিনী নিশি বাবুর ও ডাঃ মুরারী বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দার্জ্জিলিংএর মহিলাদের ও বালিকাদের জন্য কয়েকটি স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় বক্তৃতার আয়োজন করেন। ইহাতে সেখানকার বাঙ্গালী, ভুটিয়া, নেপালী ও ইংরেজ বালিকা-বিদ্যালয়ের মেয়েদিগকে একদিন সন্ধ্যার পর টাউনহলে ছায়াচিত্র সাহায্যে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় বক্তৃতা শুনাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। সেদিন সেই সময়ে গভর্ণর-মহিষীর সম্মানার্থ একটি থিয়েটারের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল এবং সেখানকার অন্যান্য অনেক মহিলারা সেই থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন। সরোজনলিনী কিন্তু টাউনহলেই বালিকাদের জন্য বক্তৃতায় থাকিলেন ও বক্তাদের কি কি বিষয় বলিতে হইবে তাহার পরামর্শ দিতে লাগিলেন।

ঐ পূজার ছুটিতেই আর একদিন সরোজনলিনী দার্জ্জিলিং নৃপেন্দ্রনারায়ণ মণ্ডপে দার্জ্জিলিং মহিলা-সমিতির মহিলাদিগের এবং দার্জ্জিলিং এর বয়স্থা বাঙ্গালী ও ভুটিয়া রমণীগণের জন্য উপরোক্ত বক্তাদের দ্বারা ঐরূপ একটি স্বাস্থ্যবিষয়ক বক্তৃতার আয়োজন করেন। সে দিন সেই সময়ে দার্জ্জিলিং ক্লাবে আমাদের একজন উচ্চপদস্থ পরম বন্ধু চা-পান উপলক্ষে একটি বড় পার্টি দেন ও আমাদিগকে সেখানে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। সরোজনলিনী কিন্তু বাজারের নীচে মেয়েদের সভায় সর্দ্দি-কাশী লইয়াও বক্তৃতার সুবন্দোবস্তের তত্ত্বাবধান করিলেন। চা-পান করিতে ক্লাবে যাইতে অস্বীকৃত হইলেন।

দার্জ্জিলিং মহিলা-সমিতির কোষাধ্যক্ষা, বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জি (Mr. W. C. Bonnerjee) মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, শ্রীমতী ব্লেয়ার (Mrs. Blair) লিখিয়াছেন :—

"দার্জ্জিলিং মহিলা-সমিতির সহিত মিসেস্ দত্তের স্মৃতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে। ১৯২৪ সালের মে মাসে মিসেস্ দত্ত যখন দার্জ্জিলিং আসেন তখন লেডী বসু আমাদের নিকট বলিলেন যে মিসেস্ দত্ত বাংলা দেশের নানা স্থানে মহিলা-সমিতি স্থাপন করিয়া অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন; মহিলাদিগের মধ্যে শৃঙ্খলার সহিত কাজ করিতে মিসেস্ দত্তের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা আছে, সুতরাং তাঁহাকে আমাদিগের সাপ্তাহিক সভায় একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলে ভাল হয়। আমরা তাঁহার কথায় উৎসাহিত হইয়া মিসেস্ দত্তকে আমাদিগের সভায় আসিয়া যোগদান করিতে অনুরোধ করিলাম। সেই প্রথম দিনেই তিনি আমাদিগের সভায় আসিয়া তাঁহার মধুর বিনম্র ব্যবহারে আমাদিগের সকলের হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিলেন, এবং সেই একদিনের ব্যবহারেই আমরা প্রত্যেকেই অনুভব করিলাম যে, তিনি যেন আমাদিগের কতকালের পরিচিতা সঙ্গিনী এবং সুহৃদ্। সেই দিনই দার্জ্জিলিং মহিলা-সমিতির উন্নতির জন্য তিনি কত নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিবার পরামর্শ দিলেন। সে সময় আমাদিগের সমিতি তেমন স্থায়ীভাবে গড়িয়া উঠে নাই। আমরা কেবল মাঝে মাঝে সকলে একত্র মিশিয়া নানারূপ আলোচনা করিতাম মাত্র। মিসেস্ দত্তের পরামর্শানুসারে আমরা আমাদিগের সমিতির মধ্যে একটী কার্য্যকরী কমিটী গঠন করিলাম এবং সমিতিকে স্থায়ী ভিত্তির উপর দাঁড় করাইবার আয়োজন আরম্ভ করিলাম। মিসেস্ দত্তকে আমরা কিছুতেই সভানেত্রী অথবা সহকারী সভানেত্রীর পদ গ্রহণ করিতে রাজী করিতে পারিলাম না। তিনি কেবল মাত্র সভ্যপদ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু আমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, কলিকাতায় তিনি যে এক কেন্দ্রসমিতি স্থাপনের আয়োজন করিতেছেন তাহা গঠিত

হইয়া গেলেই আমাদিগের দার্জ্জিলিং মহিলা-সমিতিকে তাহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবেন। আমাদিগের সমিতিতে মাঝে মাঝে সন্তানপালন, শিশুমঙ্গল এবং নারীজাতির অবশ্য-জ্ঞাতব্য নানারূপ স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের দ্বারা বক্তৃতা দেওয়াইবার জন্য তিনি আমাদিগকে পরামর্শ দেন। কলিকাতায় ফিরিয়া যাইয়া গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ম্মচারীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহারা যাহাতে দার্জ্জিলিং মহিলা-সমিতিতে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়াইবার জন্য মাঝে মাঝে বিশেষজ্ঞ বক্তা পাঠাইয়া দেন তাহার জন্য মিসেস্ দত্ত বিশেষ চেষ্টা করিবেন বলিয়া আমাদিগকে খুব উৎসাহিত করিয়া যান।

"মিসেস্ দত্ত যে দুইমাস দার্জ্জিলিং ছিলেন তখন সব সময়েই আমাদিগের সমিতিতে আসিতেন এবং জুন মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়া যান যে, অক্টোবর মাসে যাহাতে একজন ভাল বক্তা দার্জ্জিলিং মহিলা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়া যান তিনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন। এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে অক্টোবর মাসে একজন বক্তা আসিলেন। কথা ছিল যে আমরা সভার বিজ্ঞাপন দিব এবং লোকজন সংগ্রহ করার ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিব। মিসেস্ দত্তের ব্যবস্থানুসারে বক্তা ঠিক সময়ে দার্জ্জিলিং আসিয়া পৌছিলেন বটে, কিন্তু আমাদিগের ব্যবস্থার দোষে এবং কি একটা গোলমালে আমরা সভার বিজ্ঞাপন দেওয়া কিম্বা লোক-সংগ্রহের আয়োজন কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলাম না। বক্তা আসিয়া পৌছিবার একদিন কি দুইদিন আগে মিসেস্ দত্ত দার্জ্জিলিং আসিয়াছিলেন। আমরা ত এই গোলমালে এবং অব্যবস্থায় একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলাম। অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন না দিলে সভায় লোকজন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মিসেস্ দত্ত হতাশ হইবার

পাত্রী ছিলেন না। তিনি যেই এই সংবাদ শুনিলেন অমনি কমিটীর অনেক সভ্যকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলেন এবং সহরের প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া মহিলাদিগকে সভায় আসিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। ইহার ফলে সেইদিন সন্ধ্যাতেই সকল মহিলা সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেই দিন হইতে যে কয়দিন দার্জ্জিলিংএ নারীমঙ্গল সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল তাহাতে সহরের সকল মহিলা আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন এবং মিসেস্ দত্ত নানা কাজ থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক সভাতে উপস্থিত থাকিয়া সকলের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিলেন।

"নভেম্বর মাসের প্রথমেই মিসেস্ দত্ত কলিকাতায় ফিরিয়া যান। যাইবার পূর্ব্বে তিনি আমাদিগের সকলের নিকট এ দেশে এক বিরাট নারী-সমিতি স্থাপনের প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব সমুদয় ব্যক্ত করিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন কলিকাতায় এই নারীমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রসমিতি স্থাপিত হইবে এবং বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র তাহারই শাখা-সমিতি থাকিবে। শাখার সহিত কেন্দ্রের সর্ব্বদা যোগ থাকিবে এবং যখনই কোনও শাখা সমিতি নারীমঙ্গল বিষয়ে বক্তা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাহায্য চাহিয়া পাঠাইবেন তখনই কেন্দ্রসমিতি হইতে তাঁহাদিগকে সেই সকল সাহায্য করা হইবে। তিনি আরও বলিলেন, কলিকাতার এই কেন্দ্রসমিতিতে একটী মহিলা-শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে; সেখানে মহিলাদিগকে বিশেষতঃ নিঃস্ব বিধবা এবং অনাথা স্ত্রীলোকদিগকে এমন কার্য্যকরী শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইবে, যাহার দ্বারা তাহারা অনায়াসে আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে এবং পরিবারেরও যথাসাধ্য সাহায্য করিতে পারিবে। প্রত্যেক শাখা-সমিতি আপন আপন কেন্দ্র হইতে শিল্পশিক্ষার্থিনী কিম্বা

অথবা অনাথা স্ত্রীলোকদিগকে কলিকাতার এই শিল্প-শাখায় পাঠাইতে পারিবেন এবং তাঁহারা আবার নানারূপ শিল্পশিক্ষা করিয়া আপন আপন গ্রামে গিয়া অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে এই সকল কার্য্যকরী শিল্পশিক্ষা দিবেন। এইরূপে নানাস্থানে স্ত্রীলোকদিগের উদ্যোগ এবং চেষ্টায় যে এক বিরাট শিল্পসম্ভারের উৎপত্তি হইতে থাকিবে তাহা বিক্রয়ের জন্য কলিকাতার কেন্দ্রসমিতিতে এক দোকান প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সেখান হইতে এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করা হইবে। মিসেস্ দত্ত মহিলাদিগকে লইয়া কলিকাতায় যে এক কেন্দ্রসমিতি স্থাপনের আয়োজন করিতেছিলেন তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য এইরূপ ছিল। কথা হইয়াছিল যে এইবার দার্জ্জিলিংএ আসিয়া আমাদিগের সমিতিকে তিনি এই কেন্দ্রসমিতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবেন।

"আমরা কেহ তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে এই সকল মহৎ আশা ও আকাঙ্ক্ষার সূচনাতেই ভগবান তাঁহাকে আমাদিগের মধ্য হইতে কাড়িয়া লইয়া যাইবেন। যে দেহের মধ্যে আশা ও উৎসাহের এরূপ জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই দেহ যে এত ক্ষণভঙ্গুর হইবে সে কথা তখন আমরা কেহ মনেও স্থান দিতে পারি নাই। তাই যখন শুনিলাম যে মিসেস্ দত্ত আর ইহজগতে নাই তখন আমাদের হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল, আমাদের প্রত্যেকেরই মনে হইতে লাগিল যে আমরা আজ প্রকৃতই একজন অকৃত্রিম সুহৃদ্ এবং সঙ্গিনী হারাইলাম। যতদিন আমরা বাঁচিব ততদিন মিসেস্ দত্তের জ্বলন্ত উৎসাহ, মধুর চরিত্র এবং কর্ম্ম করিবার অদ্ভুত শক্তি আমাদিগের প্রাণে সর্ব্বদা নূতন উৎসাহ এবং প্রেরণা জাগাইয়া তুলিবে।"

সরোজনলিনীকে সামাজিক জীবনে বড় লোকদের সঙ্গে মিশিতে হইত বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণের যোগ ছিল দেশের আপামর সাধারণের জীবনের

সঙ্গে, আমাদের দেশের ধনবান ও পদস্থ লোকদের জীবনের কৃত্রিমতা, স্বার্থপরতা ও বিলাসিতাকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন—"ইহাদের মধ্যে বেশী লোকেই নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লইয়াই ব্যস্ত, দিনের পর দিন ইহারা একবারও গরিবদের কথা ভাবিয়া দেখে না—বা গরিবদের জন্য সমাজসেবার কার্য্যে যোগ দেয় না। এই জন্যই আমাদের দেশের এত দুর্গতি।"

তাঁহার মহিলা-সমিতিগুলিতে পদমর্য্যাদার, ছোট-বড় ব্যবধানের, সরকারী-বেসরকারীর প্রভেদ ছিল না। মেয়েরা এসব সামাজিক কৃত্রিম ব্যবধান তুচ্ছ করিয়া সাম্য ও সৌহার্দ্দ্যের ভাবে মিলিত হইতেন।

আমার অধঃস্তন কর্ম্মচারীদের বাড়ীর অন্তঃপুরে তিনি বিনা নিমন্ত্রণে অযাচিতভাবে মহিলাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে যাইতেন। তাঁহাদের আসিয়া দেখা করার অপেক্ষা করিতেন না। আমি যখনই মফঃস্বলে কোন থানা বা আপিস ইত্যাদি পরিদর্শন করিতে যাইতাম, তিনি সে সব স্থানের অধঃস্তন কর্ম্মচারীদের অন্তঃপুরে গিয়া তাহাদের মেয়েদের সহিত আলাপ করিতেন ও তাহাদের জীবন উৎসাহ দিয়া আনন্দ-ময় করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেন।

জাতির মুক্তি যে, দেশের অন্তঃপুরে লুকাইয়া আছে ইহা সরোজনলিনী দিনরাত উপলব্ধি করিতেন। অন্তঃপুরের মহিলাদের জীবনের সঙ্গে তাঁহার প্রাণের কেমন একটা ঘনিষ্ট গ্রন্থি ছিল। অন্তঃপুরের মহিলা-জগৎ তাঁহাকে যেন চুম্বকের মত আকর্ষণ করিত। তিনি প্রায়ই যে, কোন না কোন অন্তঃপুরের মেয়েদিগের সহিত আলাপ করিতে তাহাদের বাড়ী যাইতেন তাহা নহে, কোন থিয়েটার অথবা সভা উপলক্ষে

মহিলাদের পরদার অন্তরালে সমবেত হইতে দেখিলে থিয়েটার বা সভা ভঙ্গ হইবার আগেই পরদার ভিতব গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ না করিয়া ছাড়িতেন না।

অন্তঃপুর তাঁহাকে যেমন আকর্ষণ করিত, তিনিও তেমনি অন্তঃপুরকে আকর্ষণ করিয়া বাহিরের মুক্ত বিস্তৃত জীবনে টানিয়া আনিবার জন্য সর্ব্বদা আয়োজন করিতেন। টাউন-হল ইত্যাদি স্থানের প্রকাশ্য যে কোন সভাতে তিনি আমার সঙ্গে যাইতেন, এবং সেখানে অন্তঃপুর-মহিলাদের জন্য বিশেষ করিয়া পরদার বন্দোবস্ত করাইয়া তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়া আনিতেন।

ছেলে-মেয়েদের স্কুলের পুরস্কার-বিতরণী সভায় যখনই তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত তখনই তিনি বলিতেন—"পরদার বন্দোবস্ত করিয়া মহিলাদিগকেও আনিতে হইবে। ছেলেমেয়েরা পদ্য-গদ্য আবৃত্তি (recitation) করিবে; পড়াশুনার জন্য পুরস্কার পাইবে; এ সব যদি মা-বোনেরা না দেখিতে পান তবে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা ভাল কি মন্দ হইতেছে তাহা তাহারা কি করিয়া বুঝিবেন?" আমাদের বাঁকুড়ায় থাকা কালীন সেখানকার হাইস্কুলের পুরস্কার-বিতরণী সভায় তিনি এই প্রকারে মহিলাদের উপস্থিতির বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে কয়েকটি মহিলা "শিক্ষায় মাতার প্রভাব" এই বিষয়ে হাইস্কুলের যে ছেলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবে তাহাকে পুরস্কার দিবেন বলিয়া পরদার অন্তরাল হইতে ঘোষণা করেন। হাইস্কুলের ছেলেরা প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠায়। সেই সকল প্রবন্ধ মহিলা-সমিতির মহিলাগণ নিজেরা পরীক্ষা করিয়া পুরস্কার-যোগ্য প্রবন্ধের নির্ব্বাচন করেন ও পারিতোষিক প্রদান করেন। ইহাতে যে কেবল ছেলেদের উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহা নয়; ছেলেদের শিক্ষা বিষয়ে

মহিলাদের মনোযোগ বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং ইহাতে মহিলাদের মনের প্রসারতা বৃদ্ধিরও সাহায্য হইয়াছিল।

আমাদের পাবনায় থাকা কালীন যখন আমাদের ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাম্বৎসরিক স্মৃতিসভায় টাউন-হলে নিমন্ত্রণ হয়, তখন সরোজনলিনীর চেষ্টায় সেখানকার অন্তঃপুর-মহিলাদিগের সভায় যোগ দিবার জন্য পরদার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল ও অনেক অন্তঃপুর-মহিলা টাউন হলে আসিয়া পরদার অন্তরাল হইতে সভার উপদেশপূর্ণ বক্তৃতাগুলি শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে পাবনার মহিলারা কখনও সভা-সমিতিতে যোগ দিবার সুযোগ লাভ করেন নাই। এইরূপ বাঁকুড়াতেও তাঁহার নেতৃত্বে অন্তঃপুর-মহিলারা অনেকবার টাউনহলে আসিয়া মহিলা-সমিতির সভায় যোগ দিয়াছেন অথবা হাসপাতালে গিয়া রোগীদের পরিচর্য্যার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন।

তাঁহার প্রভাবে ও আদর্শে অনেক হিন্দু পরিবারের মেয়েরা স্বামীর সম্পূর্ণ সম্মতি ও সহায়তায় অন্তঃপুরের পিঞ্জর হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পৃথিবীর মুক্ত আলোক, মুক্ত বায়ু ও মুক্ত জীবন উপভোগ করিবার পরমেশ্বরদত্ত যে অধিকার তাহা গ্রহণ করিয়া নিজেদের শরীর-মনের এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন।

সরোজ-নলিনী বলিতেন :—"যাঁহারা একদিকে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বাঙ্গালী মেয়েদিগকে পর্দার অন্তরালে বদ্ধ করিয়া রাখিতে চান অথচ অপরদিকে ছেলেদের নীতি-বিবর্জ্জিত চরিত্রের জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করেন, তাঁহাদের কাছে আমার বক্তব্য এই যে, বাংলার গৃহলক্ষ্মীরা অন্তঃপুরের অন্তরালে অবগুণ্ঠনের আবরণে আবদ্ধ আছেন বলিয়াই দেশের সামাজিক,

রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত জীবন আজ এত কলুষতাময় ও নৈতিকভাব-বিবর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল দেশে নারীগণ পর্‌দা-বদ্ধ এবং জাতীয় ও সামাজিক জীবন সাধ্বী-স্ত্রীজাতির প্রভাব ও আদর্শ হইতে বঞ্চিত, সেখানেই পুরুষগণ যথেচ্ছাচারী হইবার সুযোগ পায় এবং সে সকল স্থানে সাধারণ লোকের তো কথাই নাই, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও জীবনে নৈতিক কলুষতা দেখা দেয়। জাপানের ইতিহাস হইতেও আমরা দেখিতে পাই যে, সে দেশে যত দিন ভদ্রনারীগণকে পর্‌দার অন্তরালে আবদ্ধ করার প্রথা ছিল ততদিন জাপানের পুরুষদের জীবন যথেচ্ছভাবে পরিপূর্ণ হইয়া গেইসাদের (Geisha) প্রভাবে কলুষিত ছিল। এই কুসংস্কার-মূলক প্রথার উচ্ছেদের পর হইতে জাপানের জাতীয় ও সামাজিক জীবন মার্জ্জিত ও নির্ম্মল হইয়াছে এবং পুরুষদের মধ্যে দুর্নীতির অনেক লাঘব হইয়াছে।”

আমরা যখন চট্টগ্রামে ছিলাম তখন সেখানকার ইংরাজ সিভিল-সার্জ্জন আমাদের হিতৈষী বন্ধু কর্ণেল এণ্ডারসন্ মহাশয় একদিন সরোজনলিনীকে বলিয়াছিলেন :—“ভারতবর্ষের সকল রমণী যেদিন আপনারই মত পরদার এবং ঘোমটার আড়ালে লুকাইয়া না থাকিয়া সকল কার্য্যে স্বামীর সঙ্গিনী হইয়া ঘরের ও বাইরের—পরিবারের, দেশের ও সমাজের সব কাজে নিজেদের চিন্তা, চেষ্টা ও শক্তি প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিবেন, সেই দিন হইতে আমাদের দেশের লোকের এদেশীয় লোকের শিক্ষা সাহায্য ও শাসনের জন্য এদেশে থাকিবার আর কোন প্রয়োজন হইবে না ;—আমরা তখন আপনা হইতেই চলিয়া যাইব। আপনাদের দেশের স্বদেশ-প্রেমিকগণ কবে এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝিবেন ?”

ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় সরোজ-নলিনীকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। সরোজনলিনীর মৃত্যুর পর তিনি লিখিয়াছেন :—

"আমাদের দেশে নারীদিগের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের অভাবে সামাজিক নানা প্রকার কুপ্রথা বর্ত্তমান। ফল কথা, নারীজাতিকে যতদিন আমরা টানিয়া না তুলিতে পারিব এবং তাহাদের মধ্যে বিদ্যার আলোকবিস্তার না হইবে ততদিন বাল্যবিবাহ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি কুপ্রথা ও কুসংস্কার কিছুতেই দেশ হইতে দূরীভূত হইবে না। মিঃ দত্তের উপযুক্তা পত্নী নানাবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রকৃতই তাঁহার স্বামীর সহধর্ম্মিনী ও দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপা ছিলেন। আমার কেবলই মনে হয়, কবি যে অতুলনীয় ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ
করুণা-বিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্!

শোকসন্তপ্ত স্বামীর স্মৃতিপথে তাহাই সর্ব্বদা উদিত হইতেছে।

"সরোজনলিনীর পরলোকগমনের মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে আমি কোন কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার স্বামীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। মিঃ দত্ত আমার জন্য নানাবিধ আহার্য্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী পীড়িতা, এই কারণে তিনি স্বয়ং আমার সম্বর্দ্ধনা করিতে পারিলেন না বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সরোজনলিনী তাহাতে তুষ্টা হইতে পারিলেন না,—তিনি রোগশয্যা হইতে তাঁহার পুত্রকে পাঠাইয়া নিজে উপস্থিত থাকিতে না পারায় যথেষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। হায়! তখন আমি জানিতাম না যে, এই রোগশয্যাই তাঁহার অন্তিমশয্যা হইবে।

"সরোজনলিনী চলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার পুণ্যস্মৃতি কখনই বিস্মৃত হইতে পারিব না ; এবং তাঁহার দেশহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ আমাদের নারীজাতিদের মধ্যে চিরকাল অনুকরণীয় হইয়া থাকিবে।—

"The actions of the just
Smell sweet and blossom in the dust !"

"(পুণ্যাত্মাদিগের কর্ম্মাবলী মরুভূমিতে পড়িলেও পুষ্পিত হইয়া সুরভি বিস্তার করে।)"

সরোজনলিনীর পরলোকগমনের অব্যবহিত পরে একটি ভদ্রলোক "জনৈক হিন্দু" নাম দিয়া ২৮শে জানুয়ারী তারিখের ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ পত্রিকাতে একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকের পরলোকগমনে দেশের বা সমাজের বেশী কিছু একটা যায় আসে না। কিন্তু শ্রীমতী সরোজনলিনী দত্তের পরলোক-গমনে আমাদিগের দেশ এমন একটা কিছু হারাইয়াছে যাহা সচরাচর দেখা যায় না এবং যাহার বেদনাও সহজে ভোলা যায় না। এদেশে স্ত্রীজাতির দুঃখ, দৈন্য এবং দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য খুব কম স্ত্রীলোকেরই প্রাণ কাঁদিয়া থাকে। যাঁহাদের প্রাণ কাঁদে তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, শ্রীমতী দত্তগৃহিণী এই মুষ্টিমেয় মহাপ্রাণা নারীদিগের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ; তাঁহার চিন্তা ও কার্য্যপ্রণালীর ধারার মধ্যে এমন একটা বিশিষ্টতা ছিল যাহা জনসাধারণের দৃষ্টি অতি সহজেই আকর্ষণ করিত এবং যাহা লক্ষ্য না করিয়া এড়াইয়া যাইবার যো ছিল না।

"দেশের এবং স্ত্রীজাতির কল্যাণের জন্য তিনি যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠান গড়িয়া তুলিতেছিলেন তাহার উদ্যোগ, আয়োজন ও উদ্দেশ্য

অতি সহজ এবং সরল ভাবে তিনি সকলের সম্মুখে ধরিতেন ; তাঁহার মধ্যে কোনও কষ্টকল্পনা কিম্বা হেঁয়ালীর সমাবেশ ছিল না। সামাজিক সমস্যাগুলিকে তিনি সোজাসুজিই বুঝিবার এবং সমাধান করিবার চেষ্টা করিতেন—কোনরূপ বক্রগতির আশ্রয় লইতেন না। কোনও বিষয় হাতে লইবার পূর্ব্বে তিনি তাহার আগাগোড়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া লইতেন এবং তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ হইলে তবে তাহাতে হাত দিতেন।

"সমাজ-সংস্কার ব্যাপারে এদেশে এক ব্রাহ্মসমাজই অগ্রণী ছিলেন এবং সাক্ষাৎভাবে সামাজিক দুর্নীতিগুলিকে ব্রাহ্মসমাজই আক্রমণ করিয়া আসিতেছিলেন। কালে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব দেশের উপর কমিয়া আসিতেছে। এই সময়ে সরোজনলিনী নারীজাতির মধ্যে যে সকল কার্য্যের সূচনা করিয়া তুলিতেছিলেন তাহার ফলে দেশের এবং সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইত।

"যে সকল দেশ স্বাধীন এবং যেখানে রাজশক্তি জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগের দ্বারা পরিচালিত, সে সকল দেশে সমাজ-সংস্কার করা আদৌ দুরূহ নহে। জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ ইচ্ছা করিলেই যে কোনও সংস্কার দেশে ও সমাজে চালাইয়া লইতে পারেন এবং দেশের লোকও তাহা সহজে মানিয়া লইতে পারে, কারণ এই সকল সংস্কার তাহাদিগের নিজের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগের দ্বারাই সাধিত হইতেছে। কিন্তু যেখানে রাজশক্তি বৈদেশিক জাতির হস্তে ন্যস্ত এবং বিদেশীয় গভর্ণমেণ্ট দেশের সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, সেখানে কোনরূপ সমাজ-সংস্কারের কার্য্যে সাফল্য লাভ করা অতি দুরূহ ; গভর্ণমেণ্ট কোন-

রূপ সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না ; দেশের আইন-কানুনও এই সকল সমাজসংস্কারে কোনও রূপ সাহায্য করিবে না ; সুতরাং একমাত্র ভরসা ব্যক্তিগত চেষ্টার উপর। কোনও বিষয়ে সংস্কার করিতে হইলে দেশের অগ্রণীদিগকে মাথা বাড়াইয়া সর্ব্বসাধারণকে সেই সকল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং ক্রমাগত তাহাদের বিবেকের গায়ে আঘাত করিতে হইবে। এই রূপ দীর্ঘকালব্যাপী আঘাত এবং আন্দোলনের ফলে জনসাধারণের বিবেক জাগ্রত হইলে তবেই কোন সামাজিক সংস্কার করা সম্ভব হয়। এতকাল ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজ এই কাজ করিয়া আসিতেছিলেন এবং তাহার ফলও যথেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু দেশের উপর ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি দিন দিন হ্রাস ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছে, অথচ দেশের অন্য কোনও অনুষ্ঠান এই সকল অতি প্রয়োজনীয় সমাজসংস্কার ব্যাপারে অগ্রণী হইয়া দাঁড়াইতেছে না। শ্রীমতী সরোজনলিনী দত্ত দেশের এবং সমাজের এই অবস্থা উপলব্ধি করিয়াই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সমগ্র মনঃপ্রাণ দিয়া নারীজাতিকে এক নূতন রাস্তায় চালাইয়া যাইতেছিলেন। তাই তিনি যেখানে গিয়াছেন মহিলাদিগকে লইয়া সমিতি স্থাপন করিতে-ছিলেন এবং বাহিরের মুক্ত আলোয় তাঁহাদিগকে টানিয়া আনিয়া ঘরের গণ্ডীর বাহিরে যে বিরাট বৃহৎ জগতের প্রাণের ও চিন্তার চিরন্তন ধারা বহিয়া চলিয়াছে তাহারই একটা অনুভূতি জাগাইয়া তুলিতেছিলেন। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে তিনি পাষাণ-প্রাচীরে মাথা কুটিতেছিলেন—এ দেশে নারীজাতির উন্নতিসাধন করা সোজা ব্যাপার নহে। ভবিষ্যতের জয়-পরাজয়ের কথা জানি না, কিন্তু ইহাই দেখিয়াছি যে, যেখানে এই মহাপ্রাণা রমণী নারীজাতির কল্যাণ-কামনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন

সেখানকার নারীগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন এবং নানারূপ সৎকার্য্যের সূচনা করিয়াছেন।

"কিন্তু বিধাতা সূচনাতেই এই সাধ্বীনারীকে তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরাইয়া লইয়া গেলেন। যে কণ্ঠ শত শত নারীকে মহৎ আদর্শের দিকে উদ্বুদ্ধ করিত সে কণ্ঠ আজ জন্মের মত নীরব হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু সে বাণী আজিও নীরব হয় নাই, কারণ তাহার প্রভাব আজ বাংলাদেশের নানাস্থানের নারীদিগের প্রাণে এক মহাজাগরণের অনুভূতি জাগাইয়া তুলিয়াছে।"

নারী-শিক্ষা ও সংগঠন

নারীশিক্ষা ও সংগঠন বিষয়ে সরোজনলিনী নিজের কর্ম্মজীবনের ও বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ফলে যে প্রণালী প্রকৃষ্ট বলিয়া মনে করিতেন সে সম্বন্ধে তিনি বিগত অগ্রহায়ণ মাসে "কমলা" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ—

"আজকাল মহিলাদের শিক্ষা এবং মহিলাদেব স্বাধীনতা সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ প'ড়া যায়। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, চারিদিকে মহিলাদের একটা জাগরণেব সাডা পড়ে গেছে। এটা একটা খুবই ভাল লক্ষণ। তবে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনায় অবশ্য আমাদের দেশ এখনও অনেক নিম্নস্তরে প'ড়ে আছে। শুধু আমাদেব দেশে কেন, যে দেশে মহিলারা অশিক্ষিত সে দেশের কোন উন্নতির আশা নাই। আমাদের দেশে যতই রাজনৈতিক আন্দোলন হোক না কেন, যতদিন আমাদের দেশের একদিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত থাক্‌বে ততদিন কিছুতেই কিছু হবে না। ভারতবর্ষের অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত-গ্রস্ত—যতদিন এই ব্যাধি থাক্‌বে ততদিন ভারতবর্ষেব আশাভরসা নাই। স্ত্রীশিক্ষার অভাব, বাল্যবিবাহ, অবরোধ-প্রথা ইত্যাদি নানা বকমে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে ভারতবর্ষের এক অংশ যতদিন নিজ্জীব থাক্‌বে ততদিন ভারতবর্ষের উন্নতির পথ বন্ধ। তবে আমরা এসব নিয়ে কি ব'সে থাক্‌ব? দেশের পুরুষেরা রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে মেতে আছেন, তাই আর কিছু তাঁদের ভাব্‌বার অবসর নাই, তাই মহিলাদের জেগে উঠে ব্যাধিগুলির আরোগ্যের ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। কিন্তু

কর্‌ছেন কয়জন ? শিক্ষিতা নারী আজ কাল যাঁরা আছেন, তাঁদের কিন্তু চেষ্টা নাই, উৎসাহ নাই। প্রত্যেক মহিলারই কর্ত্তব্য হ'লো পুত্র-কন্যা-দিগকে শিক্ষা দেওয়া, কিন্তু সে বিষয়ে কয়জনের লক্ষ্য আছে ? শিক্ষা ছাড়া আমাদের উন্নতির আশা নাই, দুঃখের বিষয় অনেক মা এটা উপলব্ধি করেন না। বিশেষতঃ কন্যাদের শিক্ষার মর্ম্ম এখনও মায়েরা উপলব্ধি করেন নাই। আমাদের দেশে একটা বিশ্বাস এখনও খুবই প্রবল যে, কন্যাকে শিক্ষা দেওয়া মিথ্যা পয়সা নষ্ট করা—কারণ তারা ত আর রোজগার করে না। আমি অনেককে বল্‌তে শুনেছি যে, মেয়েদের আবার শিক্ষা দিয়ে কি হবে—তারা কি চাকরি করবে ? চাকরিই যেন শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য !

"মহিলাদের সম্বন্ধে লেখ্‌বার অনেক বিষয় আছে, আজ আমি শুধু শিক্ষার বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আমি ৩ বৎসর পূর্ব্বে জাপানে গিয়েছিলাম। সে দেশ আজ এশিয়ার মধ্যে সব চেয়ে অগ্রগণ্য,—তার আজ এ-মানমর্য্যাদা কিসে ? যদি এক কথায় বল্‌তে হয় ত সে শিক্ষার জোরে। শিক্ষা-বিস্তারে যে, দেশের কত উন্নতি হইতে পারে তা জাপানে গেলে বোঝা যায়। জাপানে প্রাথমিক শিক্ষার একেবারে ছড়াছড়ি। তাদের এক একটী প্রাইমারী স্কুল আমাদের দেশের কলেজের মত। সকালে উঠে জাপানে এক মহাদৃশ্য দেখা যায়, তা হ'চ্ছে ৪ বৎসরের শিশু থেকে ১২।১৪ বৎসরের মেয়েরা শিক্ষা অর্জ্জন করতে স্কুলে চলেছে। গাড়ীতে নয়—হেঁটে। এটা সত্যই একটা দেখ্‌বার জিনিষ। আমাদের দেশে গাড়ী না হ'লে মেয়েরা এক পা চলে না। গাড়ীর যোগাড় সব সময় হ'য়ে উঠে না, সেজন্য মেয়েরা অশিক্ষিতা থাকে। আবার আমাদের দেশের মেয়েকে অনেক সময় স্কুলে পাঠান হয় না, কারণ তারা মাকে ঘরের কাজে,

ছেলে দেখার কাজে সাহায্য কর্‌বে বলে; কিন্তু মায়েরা যদি শিক্ষার মর্ম্ম বুঝ্‌তেন তাহ'লে তাঁদের কন্যাদের এমন মূল্যবান্ সময়টুকু নিজের সুখের জন্য স্বার্থের জন্য জলাঞ্জলি দিতেন না। যেদিন ঘরে ঘরে মেয়েদের স্কুলে পাঠাবার ধূম প'ড়ে যাবে, সেদিন আমাদের দেশের উন্নতির আশা দেখ্‌ব। মায়েদের আমি দোষ দিচ্ছি না—পর্‌দার মধ্যে অবরুদ্ধা মায়েরা শিক্ষার মর্ম্ম কেমন ক'রে বুঝ্‌বেন? যাঁরা কখন শিক্ষার আস্বাদ পান নাই তাঁরা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি বুঝ্‌বেন?

"দেশে অনেকগুলি কাজ র'য়েছে তার মধ্যে বিশেষ কাজ হ'চ্ছে মায়েদের শিক্ষা দেওয়া। অনেকে বলেন তা হলে কি মায়েদের আমরা স্কুলে পাঠাব? আমার উত্তর হ'চ্ছে মায়েদের স্কুলে পাঠাতে পার্‌লেই ভাল হ'ত, কিন্তু স্কুল ছাড়া যে আরও শিক্ষার উপায় নাই তা নয়। পরস্পরে মেলামেশাতে যে কত শিক্ষা হয়, যারা মেলামেশা করেছেন তাঁরাই বুঝ্‌তে পারবেন। আমার এ বিষয়ে বল্‌বার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের দেশের মায়েদের যখন স্কুলে পাঠিয়ে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়, তখন তাঁদের অন্যান্য উপায়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত। কলিকাতায় অনেক মহিলা-সমিতি, মহিলা-সম্মিলনী আছে, কিন্তু কলিকাতার বাহিরে ক'টা আছে? আমার মনে হয় প্রত্যেক জেলায় ও সহরে একটি করিয়া মহিলাদের মিলন-স্থান থাকা উচিত। তাকে সমিতিই বলুন, সম্মিলনীই বলুন বা অন্য যা নাম হয় বলুন, কিন্তু মহিলাদের এই মিলনের স্থানটি হওয়া খুব দরকার। তাহ'লে প্রথমতঃ মহিলাদের মধ্যে মেলামেশা সদ্ভাব-স্থাপন হওয়া সম্ভব হ'বে। সেই সব সভাতেই মহিলাদের অনেক রকম শিক্ষারও উপায় হ'তে পারে। আমি যা জানি না তা অন্যের কাছে শিখ্‌তে পার্‌ব, অন্যে যা জানে না তা আমার কাছে শিখবার সম্ভাবনা

আছে। এম্‌নি করে শিক্ষার আদান-প্রদান হতে পারে। অবশ্য সভা-সমিতি কর্‌তে হলে উদ্যোগী মহিলা চাই—এটা ঠিক্; কিন্তু আজকাল মহিলাদের মধ্যে যতটা শিক্ষা হয়েছে তাতে অনায়াসে মহিলারা চেষ্টা কর্‌লে সমিতি গঠন কর্‌তে পার্‌বেন বলে আমার খুব বিশ্বাস। সহরে বা জেলায় একটী মহিলা-সমিতি থাক্‌লে, সে জায়গার যে কত উন্নতি হ'তে পারে তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি ব'লেই আজ সাহস ক'রে এ বিষয়ে দু চার কথা লিখ্‌ছি। আমার নিজের এই সামান্য অভিজ্ঞতা যদি কোন জেলায় বা সহরে সমিতি গঠন বা পুনর্জীবিত কর্‌বার জন্য কাজে লাগে তাহ'লে আমার এই সামান্য অভিজ্ঞতাটাই ধন্য হবে।

"আপাততঃ প্রত্যেক সহরে যদি একটী ক'রে সমিতি গঠন করা হয় এবং পরে প্রত্যেক গ্রামে যদি একটী ক'রে মহিলা-সমিতি করা যায়, তাহ'লে দেশের উন্নতি হ'তে বেশী দেরি হবে না। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে সমিতির প্রধান কাজ হ'লো মহিলাদের মধ্যে মেলামেশা স্থাপন—এই মেলামেশা হলে মহিলারা পর্‌দার মধ্যে থেকেই অনেক রকম সৎকাজে যোগ দিতে পারেন—যেমন হাঁসপাতালে রোগীদের যা'তে সব রকম সুব্যবস্থা হয় এ বিষয় নজর রাখা; তাদের মধ্যে মধ্যে গিয়ে দেখা; তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কিছু অর্থ দেওয়া ইত্যাদি। অনেকে হয় ত বল্‌বেন এতো যাঁদের হাঁসপাতাল তাঁরা কর্‌বেন বা কর্‌ছেন। এ কথা সত্য বটে; কিন্তু যাঁরা কলিকাতার বাহিরে থাকেন নাই, তাঁরা অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, বেশীর ভাগ হাঁসপাতালে অর্থাভাবে রোগীদের ভালরূপ দেখাশোনা কর্‌তে পারা যায় না। এটী স্বীকার কর্‌তে হবে যে রোগীর শুশ্রূষা মহিলাদেরই সাজে; সেজন্য রোগীদের অভাব মহিলারাই ভালরূপ বুঝ্‌তে পারেন। যেখানে মহিলা-সমিতি আছে সেখানকার হাঁসপাতালের

রোগীদের উপর যদি মহিলারা একটু দৃষ্টি রাখেন তাহ'লে সে হাঁসপাতালের রোগীদের স্বাচ্ছন্দ্য যে বেশী হবে তা বোধ হয় বল্‌তে হবে না। আমি দু' তিনটী জেলায় মহিলা-সমিতি স্থাপন ক'রে দেখেছি যে, সেই সব জেলার হাঁসপাতালগুলি এই মহিলা-সমিতির সাহায্যের দ্বারা অনেক উপকৃত হয়েছে। এক জায়গায় হাঁসপাতালের রোগীদের খাবার জন্য বাসন একটীও ছিল না। পাতার ঠোঙায় বা মাটীর বাসনে তাদের দুধ সাবু খেতে দেওয়া হ'চ্ছিল। মহিলা-সমিতির সভ্যগণ যখন এ কথা শুন্‌লেন তখনই তাঁদের মায়ের প্রাণ এই রোগগ্রস্তদের অভাব অনুভব ক'রে কেঁদে উঠ্‌লো। অল্পদিনের মধ্যেই সমিতির মহিলাদের মধ্যে হাঁসপাতালের অভাব মোচনের চেষ্টা পড়ে গেল, এবং দেখ্‌তে না দেখ্‌তে সেই শূন্য হাঁসপাতাল থালা ঘটি বাটী ইত্যাদি রোগীদের রন্ধনের বাসন ইত্যাদিতে ভ'রে গেল। অনেক মহিলা নিজে বাসন কিনে দান কর্‌লেন, বাকি সমিতির তহবিল হ'তে দেওয়া হ'লো। যে হাঁসপাতালে বৎসরের পর বৎসর, মাসের পর মাস রোগীদের মস্ত বড় একটা অভাব পুরুষেরা একদিনের জন্যও অনুভব কর্‌লেন না, বা দেখেও তার প্রতিকার কর্‌লেন না, মহিলা-সমিতি স্থাপনের পর এক বছরের মধ্যে সে কাজ মহিলারা সম্পন্ন কর্‌লেন। এই যে এত বড় একটা জন-হিতকর কাজ, ইহা মহিলারা নিজের ঘরে ব'সে পর্‌দার মধ্যে থেকেই কর্‌লেন। এই মহিলা-সমিতির সভ্যগণ রোজ এক মুষ্টি চাল দান করেন, সেই চাল বিক্রি ক'রে তার অর্থ রোগীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দেওয়া হয়। তা'তে ফল, দুধ, রুটী, মাছ ইত্যাদি গরীব রোগীদের আশাতীত খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হয়। এসব কাজ মহিলাদের সাহায্য ছাড়া হ'তে পার্‌ত না। এরূপ মহিলা-সমিতি আবার শিক্ষা-বিস্তারেরও চেষ্টা ক'র্‌তে পারেন।

যেমন বিধবাদের জন্য শিল্পাশ্রম স্থাপন, জেনানার মধ্যে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, বালিকা-স্কুলে উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কার দেওয়া, ধাত্রীদের ভালরূপে ট্রেনিং (শিক্ষা) দেওয়া এবং শিশুমঙ্গলের কেন্দ্র স্থাপন করা। অবশ্য এ সবেতেই অর্থের দরকার, তবে যদি মহিলা-সমিতি ক'রে এসব কাজ করা যায়, তাহ'লে আমার বিশ্বাস অর্থাভাব হবে না। অবশ্য মহিলাদের মধ্যে চেষ্টা ও পরস্পর সহায়তার দরকার। একজন মহিলার দ্বারা এ সকল কাজ হওয়া সম্ভব নয়। মধ্যে মধ্যে সমিতির অধিবেশনে আলোক-চিত্রের দ্বারা স্বাস্থ্যবিষয়ক বক্তৃতা দেওয়ানো দরকার। এই সকল আলোক-চিত্রের সাহায্যে বক্তৃতার প্রভূত উপকার আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

"একবার একটী ৬।৭ বৎসরের মেয়ে তার মার সঙ্গে এ রকম একটি আলোকচিত্রের দ্বারা বক্তৃতা শুনে বাড়ী যায়। তার পর সে মেয়েটী ভাত খেতে ব'সেছে—তখন তার ভাতে কয়েকটী মাছি ব'সেছে দেখে সে তৎক্ষণাৎ ভাত খাওয়া বন্ধ করে দিল। মা জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাত খেলি না?" সে উত্তর দিল—"মা, সেদিন শুনে এলে না, যে খাবারে মাছি বসে সে খাবার খেলে অসুখ করে? আমি মাছিবসা ভাত খাব না।" মায়েদের কয়জনের মনে এ ভাব উদয় হয়েছিল জানি না, কিন্তু এই শিশুটীর মনের মধ্যে বক্তৃতার সদুপদেশগুলি এমনি সুন্দরভাবে লেগেছিল যে, সে সদুপদেশটা কাজে পরিণত হয়েছিল। এই শিশু কন্যাটী দুদিন পরে যখন মা হবে, তখন নিশ্চয় এই উপদেশগুলি তার মজ্জাগত হ'য়ে থাকবে। আমাদের এই শিশু কন্যারা যখন মা হবে তখনকার কথা একবার ভেবে দেখুন। এ যুগের মায়েদের এ সব বক্তৃতায় হাতে হাতে যদি ফল না দেয়—ভয় নাই; মায়েদের মেয়েরা যখন মা হবে তখন আমরা সুফল পাবই। আমাদের দেশে যত কিছু আন্দোলন হোক্ না

কেন, ঘরে ঘরে মহিলারা শিক্ষিত না হ'লে কিছু হবে না। আমাদের দেশে ১০।১২ বৎসরের মেয়েদের বিবাহ হয়, ১৪।১৫ বৎসরে মেয়েরা মায়েদের পদ পান। এই সকল কচি মেয়েদের শিশুপালনের কতটা অভিজ্ঞতা আছে, তা বোধ হয় সকলেই জানেন! সেই সকল কচি স্ত্রী ও মায়েদের শিক্ষা দিতে হবে তাঁরা স্ত্রী ও মায়ের পদে প্রতিষ্ঠিত হবার পর; কারণ তার আগে ত তাঁরা কেবল মাত্র শিশু। স্কুলে যখন আর এঁদের শিক্ষা দিবার উপায় নেই, তখন এই মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠা ক'রে তার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া একটি সহজ উপায়।

"আমি তাই আমাদের দেশের মা-বোনেদের অনুরোধ ক'রছি, জেগে উঠুন—প্রতি জেলায়, প্রতি সহরে, প্রতি গ্রামে মহিলা-সমিতি স্থাপন করুন। স্ত্রী-শিক্ষার প্রভাবে দেশ ছেয়ে ফেলুন, তা ছাড়া দেশের প্রকৃত উন্নতির আশা নাই। দেশের মহিলারা জাগ্রত হোন, নতুবা যতই স্বাধীনতার আশা করি না কেন, সবই বিফল হবে।"

———

কলিকাতার কর্ম্মজীবন

পরলোক-গমনের এক বৎসর কাল পূর্ব্বে কলিকাতায় আসা অবধি সরোজনলিনী এখানকার নানাবিধ মহিলা-সম্পর্কিত সৎকাজে যোগ দিয়াছিলেন। শুধু তাহা নয়, এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই কলিকাতার মহিলা-উন্নতি-সম্পর্কিত প্রায় সকল প্রধান প্রতিষ্ঠানের নেত্রীত্বের ভার যেন আপনা হইতেই তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিগত কলিকাতা মহা-প্রদর্শনীতে তিনি কলিকাতা মহিলা-সমিতির "ষ্টল" এর (Stall) আংশিক ভাবে ভার-প্রাপ্ত থাকিয়া ইডেন্ গার্ডেনে (Eden Garden) দিনরাত খাটিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্তা মিসেস্ পি, কে, রায় বলিয়াছেনঃ—"তাঁহার শৃঙ্খলা ও কর্ম্মকুশলতার ফলেই আমরা কলিকাতা মহিলা-সমিতির ষ্টলে সাত শত টাকা তুলিতে পারিয়াছিলাম। ষ্টলের ভারপ্রাপ্ত অন্যান্য মেয়েরা অনেক সময় দেরি করিয়া আসিতেন অথবা কখন নিজে না আসিয়া অন্য লোককে বদলি স্বরূপ পাঠাইতেন। আর যখন আসিতেন তখনও তাড়াহুড়োতে কাজের অসুবিধা ঘটাইতেন। সরোজনলিনী কিন্তু ঠিক সময়ে উপস্থিত হইতেন, কখনো আসিতে কামাই করিতেন না, আর ধীর স্থির ভাবে এত সুন্দর শৃঙ্খলার সহিত কাজ চালাইতেন যে, ষ্টলের কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত বলিত—'ইঁহার সঙ্গে কাজ করিতে আরাম হয়।' "

সরোজনলিনী শিশুমঙ্গল-প্রদর্শনী (Baby week) কমিটির কেন্দ্র-সমিতির ও তাহার নানাবিধ সব্ কমিটির সভ্য হইয়া গত বৎসর কাজ

করিয়াছিলেন। এবারও সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী সহায়িকা বালিকাদলের (Girl Guide) কমিটির সদস্য ও কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। মাননীয় গভর্ণর-পত্নীর নেত্রীত্বে দেশীয় ও বিদেশীয় মহিলাদের "কলিকাতা নারী-কর্ম্ম-সঙ্ঘ" (Calcutta League of Women Workers) নামক যে এক বড় প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার ভারতীয় মহিলা-বিভাগের সম্পাদিকা নির্ব্বাচিত হইয়া শেষ অসুখের পূর্ব্বে একমাস মধ্যেই তাহার সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। মাননীয়া লেডী বসু তাঁহার কৃতিত্ব দেখিয়া তাঁহাকে নারী-শিক্ষা-সমিতির কৌন্সিল্ (Council) এর সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়া সেই প্রতিষ্ঠানে তাঁহার দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ হইয়া কাজ করিতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, ও নারীশিক্ষা-সমিতির অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাসাগর বাণীভবনের সম্পূর্ণ ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই সরোজনলিনী বাণীভবনের বিধবাদের শিল্প শিক্ষার প্রভূত আয়োজন করিতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার আরও অনেক প্রধান প্রধান মহিলা-অনুষ্ঠানের নেত্রীত্বের ভার লইবার জন্য তাঁহাকে পীড়াপাড়ি করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সময়াভাবে তাহা লইতে পারিতেছিলেন না।

একান্ত সময়াভাব সত্বেও কিন্তু তিনি কখনও কর্ম্মের ডাককে অবহেলা করিতে পারিতেন না। গত বৎসর কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে যখন নূতন আইনের নিয়মে স্ত্রীলোকদিগের মিউনিসিপালিটির সদস্য নির্ব্বাচনে 'ভোট' প্রাপ্তির অধিকার প্রথম দেওয়া হয়, তখন স্ত্রীলোকদের 'ভোট' লিপি-বদ্ধ করিবার সুব্যবস্থার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। মিউনিসি-পালিটির চেয়ারম্যানের আমন্ত্রণে সরোজনলিনী সেই কমিটিতে যোগ দেন এবং পার্ক ষ্ট্রীটে গেলষ্টান্ মেন্সন্সে (Galstaun Mansions)

কয়েকটি ওয়ার্ডের মহিলাদিগের ভোট নিবার জন্য যে কেন্দ্র স্থাপিত হয় তাহার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন। নির্ব্বাচনের দিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেখানে থাকিয়া খাটিয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত সেই কেন্দ্রের কাজ সম্পাদন করেন।

দেশের ডাক

কলিকাতার শত কর্ম্মের মধ্যে ও কলিকাতার শত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকিয়াও বঙ্গের বিশাল মফঃস্বলের সহরের ও গ্রামের নারীদিগের দুঃখকষ্ট-পূর্ণ জীবনের সকরুণ ক্রন্দন সরোজনলিনীর কানে দিন রাত বাজিত ও তাহাদের দুঃখে তাঁহার প্রাণ প্রতিদিন কাঁদিত। তিনি বলিতেন, "দেখ, কলিকাতার কি পুরুষ কি মেয়ে সকলেই নিজেদের জীবনকে এমন ভাবে বিজড়িত করিয়া ফেলেন যে, বাইরে যে আসল বিশাল দেশটা পড়িয়া রহিয়াছে তাহার কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান। বাইরের দেশটার কথা, তার শত-সহস্র গ্রামের কথা, বিশেষতঃ সামাজিক, আর্থিক, দৈহিক শত শত দুঃখকষ্ট প্রপীড়িত লক্ষ লক্ষ নারীর আর্ত্তনাদ তাঁহাদের প্রাণে বাজে না। এদের উন্নতির, এদের সাহায্যের জন্য তাঁহারা কোন যুক্তচেষ্টা করেন না—এ লজ্জা, এ অভাব আমি ঘুচাইবই ঘুচাইব। আমি সমগ্র বঙ্গদেশের নারীজাতিকে যুক্তজীবনে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য কলিকাতায় একটী কেন্দ্রীয় মহিলা-সমিতি স্থাপন করিবই করিব।" এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি প্রস্তাব তাঁহার পরলোক-গমনের কয়েকমাস পূর্ব্বে ইংরেজিতে লিখেন। তাহাতে লিখিয়াছিলেন :—

"কলিকাতায় আস্‌বার পর থেকে আমি কতকগুলি নারী-সমিতিতে যোগ দিয়েছি, অনেক ইংরেজ মহিলা আর কয়েকজন ভারতীয় মহিলা এ বিষয়ে খুব চমৎকার কাজ কর্‌ছেন দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু যেটুকু করা হ'চ্ছে দেখেছি আর শুনেছি, তার বেশীটুকুই কল্‌কাতার অধিবাসীদের জন্তই

হ'চ্ছে। এটা যে একটা খুব দরকারী কাজ, আর এটা যে করা চাই, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। এরূপ কাজে সাহায্য কর্‌বার জন্য আমার শক্তিতে যা কর্‌তে পারা যায়, তা আমি কর্‌তে পার্‌লে খুব আনন্দিত হ'বো। কিন্তু আমার মনে হয়, সেই সঙ্গে যা'তে পল্লীগ্রামের বা মফঃস্বলের সাহায্য হ'তে পারে সে রকম কাজ আমাদের মধ্যে কারো-কারো হাতে নেওয়া উচিত।

"এ-কাজটি বড় কঠিন, এতে সন্দেহ নেই, আর বোধ হয় কল্‌কাতায় বাস কর্‌ছেন এমন মহিলাদের অনেকেই এর প্রয়োজনীয়তা বুঝ্‌বেন না। কিন্তু এটা একটা বড় দরকারী কাজ, আর আমাদের কেউ এ কাজ হাতে না নিলে দেশের যথার্থ উন্নতি হ'তে পার্‌বে না।

"আমার জীবনের বেশীর ভাগ আমি মফঃস্বলেই কাটিয়েছি, আব বাংলার পল্লী ও গ্রাম্য জীবনের অনেক কিছু দেখেছি। বোধ হয়, এই কারণেই মফঃস্বলের গ্রামে গ্রামে আমাদের যে সব বোনেরা আছেন তাঁদের জন্য সহানুভূতি অনুভব ক'রে আস্‌ছি; তাঁ'রা সবদিকেই কল্‌কাতার লোকের চেয়ে পিছিয়ে আছেন, এবং আমার মনে হয় তাঁদের সাহায্য করা আমাদের কর্ত্তব্য। মফঃস্বলের যে সব গ্রামে আর সহরে আমি সেদিন পর্য্যন্ত বাস ক'রে এসেছি, সেখানকার আমাদের ভগ্নীদের উন্নতির জন্য আমার নিজের সামান্য শক্তি-অনুসারে অল্প-কিছু কর্‌বার চেষ্টা করেছি। মফঃস্বলের মেয়েদের প্রশস্ততর চিন্তা ও ভাবের সংস্পর্শে এনে, আর তাঁদের সুবিস্তৃতভাবে দেখ্‌বার শক্তি দিয়ে খুব ভাল কাজ কর্‌তে পারা যায়; আর আমার মনে হয়, জেলায় জেলায় এখন যে সব ছোটো ছোটো প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলিকে সাহায্য কর্‌বার জন্য যদি আমরা কল্‌কাতায় একটি বড় সমিতি স্থাপন কর্‌তে পারি তা হ'লে বড়ই কাজের হয়।

"আমাদের যে সকল ভগিনী জীবনের বেশীর ভাগ সহরে কাটিয়েছেন, বাংলার গ্রামে গ্রামে আর সহরে সহরে কি যে বিরাট্ কাজ কর্‌বার ক্ষেত্র প'ড়ে রয়েছে তা তাঁরা যে ধারণাও কর্‌তে পার্‌বেন, আমার তা মনে হয় না। এই কাজটি খুবই শক্ত নিশ্চয়, কিন্তু আমার মনে হয় এটা আমাদের হাতে নেওয়া উচিত। কারণ মফঃস্বলের সহরের আর গ্রামের মেয়েদের শিক্ষা না দিলে এবং তাঁদের চিন্তার ক্ষেত্র ও মনোভাবকে প্রসারিত করে' না তুল্‌লে দেশের যথার্থ উন্নতি হ'তেই পারে না।

"বাংলার অনেক জেলাতে মহিলাসমিতি এখনও বর্ত্তমান আছে। কতকগুলিতে বেশ কাজ হচ্ছে; কিন্তু অন্যগুলি—বোধ হয় বেশীর ভাগই এই শ্রেণীর—খালি নামেই আছে; তা'র কারণ এই যে, উপযুক্ত সহানুভূতি বা যোগ্যতা যাঁর আছে এমন কেউ পরিচালনা কর্‌বার নেই। এই হেতু আমি একটি কার্য্যপ্রণালী স্থির করেছি, এটিকে যদি ঠিকমত প্রয়োগ করা যায়, তা হ'লে এই কঠিন ব্যাপারটির সমাধান হবে এবং এই সব বিক্ষিপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে একটি কেন্দ্র-সমিতির সংস্পর্শে থাক্‌তে সাহায্য কর্‌বে, ও তাদের জন্যে যে পরামর্শ ও পরিচালনা আবশ্যক, তা'রও সুবন্দোবস্ত হবে।

"বঙ্গীয় মহিলা-কেন্দ্র-সমিতি" নাম দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান কল্‌কাতায় হওয়া উচিত, এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কর্ম্মী মেয়েদের মধ্যে থেকে হওয়া চাই।

"এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের একটি কার্য্যকরী সভা থাক্‌বে তা'তে জন ছয় সদস্য, একজন সভানেত্রী, ও আবশ্যকমত একজন বা দু'জন কর্ম্মসচিব থাক্‌বেন। এই প্রতিষ্ঠান কি করে' মহিলা সমিতি গড়ে' তুল্‌তে হয়, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে খবর ও পরামর্শ দেবেন; বক্তৃতা দেবার লোক

পাঠাবেন, আদর্শ নিয়মাবলী ও যাতে সাহায্য হয় এমন পুস্তিকা প্রভৃতি পাঠাবার জন্য এবং আবশ্যক হ'লে সুযোগ্য বিজ্ঞানবিৎ প্রদর্শক বা বক্তা (সম্ভব হ'লে ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবি-সমেত) যোগাড় করিতে সাহায্য কর্‌বেন; এককথায় এই কার্য্যটিতে সাধারণভাবে সব বিষয়ে উৎসাহ দেবার জন্য 'মহিলা-কেন্দ্র-সমিতি' প্রস্তুত থাক্‌বেন।"

সরোজনলিনী প্রথমে তাঁহার প্রস্তাবটা কলিকাতা নারী-কর্ম্মী-সঙ্ঘের (Calcutta League of Women Workers) কাছে দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত না হওয়ায় তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে শ্রীযুক্তা লেডী বসু নারী-শিক্ষা সমিতি হইতে সরোজনলিনীকে এই কাজের ভার লইতে অনুমতি দেন এবং সেই জন্য সরোজনলিনীকে সম্পাদিকা করিয়া সরোজনলিনীর নির্ব্বাচন-অনুযায়ী কয়েকটি ইংরেজ ও বাঙ্গালী মহিলা লইয়া একটি পৃথক কমিটি গঠন করা হয়। সরোজনলিনী এই কমিটির দ্বারা সমগ্র বঙ্গদেশের নারীদিগকে মহিলা-সমিতিতে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিতে পাইতে না যাইতেই শেষ রোগশয্যায় শায়িত হইয়া পড়েন।

সরোজনলিনীর পরলোক-গমনের পরে বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্তা মহারাণী-অধিরাণীর পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত "সরোজনলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল-সমিতি" নামক প্রতিষ্ঠান সরোজনলিনীর অভিপ্রেত এই নারী-সংগঠন কার্য্যের ভার লইয়াছেন।

আমার জন্মভূমি শ্রীহট্ট জেলার মহিলাদের শিক্ষার উন্নতি-সাধনের উদ্দেশ্যে সরোজনলিনী "শ্রীহট্ট সম্মিলনী" নামক প্রতিষ্ঠানের সহযোগী-সভানেত্রী (Vice President) নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলীর (Bengal Social Service League) কর্ম্মী শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসু

মহাশয়ের সহযোগে তিনি কলিকাতার প্রত্যেক ওয়ার্ডে নারীদের সভা আহ্বান করিয়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পোন্নতি বিষয়ক আলোচনার ব্যবস্থা করিবার আয়োজন করিতেছিলেন এবং বঙ্গদেশময় যাহাতে পর্য্যটক শিল্প-শিক্ষকের বন্দোবস্ত করিয়া কেন্দ্রে কেন্দ্রে নারীদিগকে অর্থকরী শিল্প শিক্ষা দিতে পারা যায় তাহার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতন-বিভাগের কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের সহিত বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতন শিল্প ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানের সাহায্যে পল্লীগ্রামের মহিলাদের নানাবিধ পল্লীশিল্প ও স্বাস্থ্য-নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ চলিতেছিল।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের উজ্জ্বল সন্তান বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার লিখিত 'সাম্য' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

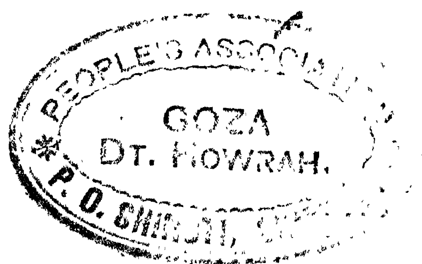
"আমাদিগের দেশীয়া স্ত্রীগণের দশা বড়ই শোচনীয়। ইহার প্রতিকার জন্য কে কি করিয়াছেন? পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায় অনেক যত্ন করিয়াছেন—তাঁহাদিগের যশঃ অক্ষয় হউক; কিন্তু এই কয়জন ভিন্ন সমাজ হইতে কিছুই হয় নাই। দেশে অনেক এসোসিয়েসন্, লিগ্, সোসাইটী, সভা, ক্লব্ ইত্যাদি আছে, কাহারও উদ্দেশ্য সমাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য ধর্ম্মনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য দুর্নীতি, কিন্তু স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য কেহ নাই। পশুগণকে কেহ প্রহার না করে, এ জন্য একটি সভা আছে, কিন্তু বঙ্গদেশের অর্দ্ধেক অধিবাসী স্ত্রীজাতি—তাহাদিগের উপকারার্থে কেহ নাই। আমরা কয়দিনের ভিতর অনেক পাঠশালা, চিকিৎসাশালা এবং পশুশালার জন্য বিস্তর অর্থব্যয় দেখিলাম, কিন্তু এই বঙ্গসংসার-রূপ পশুশালার সংস্করণার্থ কিছু করা যায় না কি?

"যায় না, কেন না, তাহাতে রঙ্ তামাসা কিছু নাই। কিছু করা যায় না, কেন না, তাহাতে রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর, ষ্টার অব ইণ্ডিয়া

প্রভৃতি কিছু নাই। আছে কেবল মূর্খের করতালি। কে অগ্রসর হইবে ?"

সরোজনলিনী নিজের প্রাণের ভিতর স্বতঃই এই মহতী প্রেরণার আহ্বান পাইয়াছিলেন, তাই তিনি বাংলার স্ত্রীজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তাঁহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্য সম্পাদন করিবার জন্য প্রতি গ্রামে ও প্রতি সহরে মহিলা-সমিতি স্থাপন ও কলিকাতায় একটি প্রাদেশিক মহিলা-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়া নারীশিক্ষা ও নারী-জাগরণের এক বৃহৎ অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

জগদীশ্বর তাঁহাকে আরো এক উচ্চতর কর্ম্মক্ষেত্রে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছেন; তাই বলিয়া তাঁহার এখানকার এই মহৎ কর্ম্মক্ষেত্রে কি কর্ম্মীর অভাব রহিয়া যাইবে ?



অনন্তের আহ্বান

আমি পরম সৌভাগ্যবান্ আমার জীবনকে তিনি তাঁহার আত্মার ও স্বভাবের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে প্রেমে ও গরিমায় পরম পবিত্র করিয়া গৌরব-মণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। সে দান, সে গৌরব তো আমি পূর্ণমাত্রায় পাইয়াছি ; সে গৌরব, সে মর্য্যাদা আমি যদি রক্ষা না করিতে পারি তবে ত আমারই চরম পরাজয়, আমারই পরম দুর্ভাগ্য।

আমি তো তাঁহাকে হারাই নাই। তাঁহার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তাহা অনন্ত-কালের। নশ্বর পার্থিব দেহের বিকার তাহাকে ছিন্ন করিতে অসমর্থ। অনন্ত-লোক হইতে তাঁহার প্রেরণা, তাঁহার সাহায্য আমি প্রতি-মুহূর্ত্তে অনুভব করিতেছি। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর চরিত্রের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত ও জীবন্ত অনুপ্রেরণা হইতে বঞ্চিত হইয়া দেশ ও সমাজ যে কি অসীম ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহাই ভাবিতেছি, আর তাঁহার অকাল স্বর্গারোহণে তাঁহার আরব্ধ ও অভিপ্রেত যে সকল সামাজিক সদনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল, সেইগুলির কি হইবে ও সেইগুলিকে কে চালাইবে ইহা ভাবিয়া আমার হৃদয় বিচলিত হইতেছে।

তাঁহার স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভাল ছিল। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা সত্ত্বেও তিনি স্বভাবতঃই সুস্থ ও সবল ছিলেন। তাঁহার শেষ পীড়া ও পরলোকগমন জগদীশ্বরের তাঁহার প্রতি অমরলোকে আরো কোন বড় কাজের জন্য আহ্বান ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। যাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসেন বা তাঁহার কাজের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন বা করিতে চাহেন, তাঁহাদের উপর তিনি এই ভার দিয়া গেলেন যে, তাঁহার এই

সকল আরব্ধ ও অভিপ্রেত কাজ তাঁহার দৈহিক অবর্ত্তমানেও যেন সুসাধিত হয়। তাঁহারা যদি সকলে ইহাতে যথাসাধ্য সাহায্য করেন, তবেই তাঁহার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা-প্রদর্শন করা হইবে।

পরিশেষে আমাদের জনৈক বন্ধু এ বিষয়ে যে হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া এই সংক্ষিপ্ত জীবনীটি সমাপ্ত করিব :—

"সরোজনলিনী তাঁহার কর্ম্মময় ঐহিক জীবনে যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, কিসে স্ত্রীজাতির, বিশেষতঃ বাংলাদেশের নারীদিগের মঙ্গল হইবে, কেমন করিয়া তাঁহাদিগের সর্ব্ববিধ উন্নতি-সাধনে সহায়তা করিতে পারিবেন, এই জন্যই যেন তাঁহার জীবনটাকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য এই ছিল যে, প্রত্যেক নারী যেন শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, চরিত্রে এবং কর্ম্মে 'সুমাতা' হইতে পারেন এবং তাঁহাদের গৃহ যেন আনন্দ নিকেতন হইয়া উঠে।

"তিনি আজ অমরলোকে চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার অমূল্য জীবন, মহান্ আদর্শ, এবং তাঁহার আরব্ধ কার্য্য আমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। ভগবান আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং তাঁহার অমর আত্মা আমাদিগকে উৎসাহিত করুন, যেন আমরা তাঁহার আরব্ধ কার্য্য যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়া এবং আমাদিগের দেশের নারীজাতির কল্যাণের জন্য জীবনপাত করিয়া তাঁহার স্মৃতির সম্মান করিতে পারি। যেন আমাদিগের সকল কার্য্য সেই অমর আত্মার দ্বারা চালিত এবং অনুপ্রাণিত হয়!"

—:•:—

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-সূচী

পৃষ্ঠা।

বাংলাদেশে নারীমঙ্গল-সমিতির প্রতিষ্ঠা ... ১

মহিলা-সমিতি গঠন-প্রণালী ... ৭

সরোজ-নলিনীর নেতৃত্বে বীরভূম মহিলা-সমিতির কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ... ১০

সরোজ-নলিনীর বাঁকুড়া-পরিত্যাগের পর বাঁকুড়া মহিলা-সমিতির কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ... ১৯

বীরভূম মহিলা-সমিতির সুলতানপুর গ্রামে অধিবেশনে সরোজ-নলিনীর অভিভাষণ ... ২২

বীরভূম মহিলা-সমিতির প্রতি বিদায় অভিভাষণ ... ২৫

বাঁকুড়ায় মহিলা-সমিতি স্থাপন উপলক্ষে অভিভাষণ ... ২৮

বাঁকুড়া মহিলা-সমিতির প্রতি বিদায় অভিভাষণ ... ৩১

বীরভূমের অন্নক্লিষ্ট নরনারীর দুঃখলাঘবের জন্য আবেদন ... ৩৫

বীরভূমের জন-সাধারণের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ ... ৩৬

বীরভূম মহিলা-সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে গীত দুইটী গান ... ৩৭

শোক-প্রকাশক পত্র ... ৪১

শ্রাদ্ধোপলক্ষে দানের তালিকা ... ৫১

বাংলাদেশে নারীমঙ্গল-সমিতির প্রতিষ্ঠা। *

কল্‌কাতায় আস্‌বার পর থেকে আমি কতকগুলি নারী-সমিতিতে যোগ দিয়েছি, অনেক ইংরেজ মহিলা আর কয়েকজন ভারতীয় মহিলা এ বিষয়ে খুব চমৎকার কাজ কর্‌ছেন দেখ্‌তে পাচ্ছি। কিন্তু যেটুকু করা হ'চ্ছে দেখেছি আর শুনেছি, তার বেশীটুকুই কল্‌কাতার অধিবাসীদের জন্যই হ'চ্ছে। এটা যে একটা খুব দরকারী কাজ, আর এটা যে করা চাই, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। এরূপ কাজে সাহায্য কর্‌বার জন্য আমার শক্তিতে যা কর্‌তে পারা যায়, তা আমি করতে পার্‌লে খুবই আনন্দিত হবো। কিন্তু আমার মনে হয়, সেই সঙ্গে যাতে পল্লীগ্রামের বা মফঃস্বলের সাহায্য হ'তে পারে সে রকম কাজ আমাদের মধ্যে কারো-কারো হাতে নেওয়া উচিত।

এ-কাজটি বড় কঠিন, এতে সন্দেহ নেই, আর বোধ হয় কল্‌কাতায় বাস কর্‌ছেন এমন মহিলাদের অনেকেই এর প্রয়োজনীয়তা বুঝ্‌বেন না। কিন্তু এটা একটা বড় দরকারী কাজ, আর আমাদের কেউ একাজ হাতে না নিলে দেশের যথার্থ উন্নতি হ'তে পার্‌বে না।

আমার জীবনের বেশীর ভাগ আমি মফঃস্বলেই কাটিয়েছি, আর বাংলার পল্লী ও গ্রাম্য জীবনের অনেক কিছু দেখেছি। বোধ হয়, এই কারণেই মফঃস্বলের গ্রামে-গ্রামে আমাদের যে সব বোনেরা আছেন তাঁদের জন্য সহানুভূতি অনুভব ক'রে আস্‌ছি; তাঁ'রা সবদিকেই কল্‌কাতার লোকের চেয়ে পিছিয়ে আছেন, এবং আমার মনে হয় তাঁদের সাহায্য করা আমাদের কর্ত্তব্য। মফঃস্বলের যে সব গ্রাম আর সহরে আমি সেদিন পর্য্যন্ত বাস ক'রে এসেছি, সেখানকার আমাদের ভগ্নীদের উন্নতির জন্য আমার নিজের সামান্য

---

* এই প্রবন্ধটি লেখার পর লেখিকার আকস্মিক পরলোক-গমন ঘটে। তাঁহার পরলোক-গমনের পর এই প্রবন্ধ মূল ইংরেজীতে 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় ও ইহার বাংলা অনুবাদ 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

শক্তি-অনুসারে অল্প-কিছু কর্‌বার চেষ্টা করেছি। মফঃস্বলের মেয়েদের প্রশস্ততর চিন্তা ও ভাবের সংস্পর্শে এনে, আর তাঁদের সুবিস্তৃতভাবে দেথ্‌বার শক্তি দিয়ে খুব ভাল কাজ কর্‌তে পারা যায়; আর আমার মনে হ্য়, জেলায় জেলায় এখন যে-সব ছোটো-ছোটো প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলিকে সাহায্য কর্‌বার জন্য যদি কল্‌কাতায় একটি বড সমিতি আমরা করতে পারি তা হ'লে বড়ই কাজের হয়।

আমাদের যে-সকল ভগিনী জীবনের বেশীর ভাগ সহরেই কাটিয়েছেন, বাংলার গ্রামে-গ্রামে আর সহ্‌রে-সহ্‌রে কি যে বিরাট্ কাজ কর্‌বার ক্ষেত্র প'ড়ে র'য়েছে তা তাঁরা যে ধারণাও কর্‌তে পার্‌বেন, আমার তা মনে হয না। এই কাজটি, খুবই শক্ত নিশ্চয়, কিন্তু আমার মনে হয় এটা আমাদের হাতে নেওযা উচিত। কারণ মফঃস্বলের সহরের আর গ্রামের মেয়েদের শিক্ষা না দিলে এবং তাঁদের চিন্তার ক্ষেত্র ও মনোভাবকে প্রসারিত ক'রে না তুল্‌লে দেশের যথার্থ উন্নতি হ'তেই পারে না।

জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের সহধর্ম্মিণী হিসাবে বাংলার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জেলায় চারিটি মহিলা-সমিতি গড়ে' তোল্‌বার সুযোগ আমার ঘটেছিল। দুঃখের বিষয় তা'র একটি এখন লোপ পেয়েছে। এর কারণ হ'চ্ছে এই যে, এ'কে দাঁড় করিযে দিতে না দিতেই আমার স্বামী সেখান থেকে বদ্‌লি হওযায সে জেলা ছেড়ে আমাদেব চলে' যেতে হ'য়েছিল। আর তিনটী এখনও চল্‌ছে। এর মধ্যে একটি সৌভাগ্যক্রমে গুটিকয়েক মহিলা-কর্ম্মী পেয়েছে, যাঁরা বেশ উৎসাহের সহিত কাজ কর্‌ছেন; কিন্তু আর দু'টী নাম-মাত্র টিকে' আছে। এ-দু'টীর একজন ক'রে সম্পাদিকা আছেন বটে, আর তিনি পরিশ্রম কর্‌তেও প্রস্তুত, কিন্তু পরামর্শ ও সাহায্যের অভাবে তাঁরা কিছু কর্‌তে পার্‌ছেন না।

মহিলা-সমিতিগুলি বেশীর ভাগ রাজকর্ম্মচারীদের পত্নীদের দ্বারা কোনো-না-কোনো সমযে স্থাপিত হ'যেছিল। এ কথাটা আমার ব'লে দেওয়া দরকার। এই জন্যই, যিনি একটী মহিলা-সমিতি স্থাপন কর্‌লেন তিনি যেই সে জেলা থেকে চ'লে গেলেন, অম্‌নি সেখানকার কাজের হানি হ'তে থাকে। অবশ্য যদি আর কোনো সহৃদয়া মহিলা এই কর্ম্মভার গ্রহণ করেন, তা হ'লে কোনো ক্ষতি হয় না—কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটি খুবই কম দেখা যায়।

বাংলার অনেক জেলাতে মহিলা-সমিতি এখনও বর্ত্তমান আছে। কতকগুলিতে বেশ কাজ হচ্ছে; কিন্তু অন্যগুলি—বোধ হয় বেশীর ভাগই এই শ্রেণীর—খালি নামেই আছে,

তা'র কারণ এই যে, উপযুক্ত সহানুভূতি বা যোগ্যতা যাঁর আছে, এমন কেউ পরিচালনা কর্‌বার নেই। এই হেতু আমি একটি কার্য্যপ্রণালী স্থির ক'রেছি, এটিকে যদি ঠিক মত প্রয়োগ করা যায়, তা হ'লে এই কঠিন ব্যাপারটির সমাধান হবে এবং এই সব বিক্ষিপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে ও একটি কেন্দ্র-সমিতির সঙ্গে সংস্পর্শে থাক্‌তে সাহায্য কর্‌বে, ও তাদের জন্য যে পরামর্শ ও পরিচালনা আবশ্যক, তা'রও সুবন্দোবস্ত হবে।

ভাঁলো ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে পাব্‌লে মহিলা-সমিতি জেলায় সদরে বা গ্রামে কি-কি কাজ কব্‌তে পাবে, সে সম্বন্ধে যে সকল মহিলার বিশেষ কোন ধারণা নেই, তাঁদের বুঝিয়ে দেবার জন্য বাঁকুড়া মহিলা-সমিতি কি কাজ কর্‌ছেন, আর ভালভাবে ব্যবস্থা হ'লে আরও কি কব্‌তে পারেন, তার ছোটো খাটো একটু পরিচয় দিচ্ছি। আমরা ৮০ জন সদস্য নিযে সমিতি আরম্ভ করি, সদস্যের বার্ষিক চাঁদা এক টাকা ক'রে। কয়েক জন সহৃদয়া মহিলা অবশ্য স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এক টাকার বেশী দিতেন। সমিতির একটি কার্য্যকরী সভা আছে, তা'তে একটি সভানেত্রী, একজন সহকারী সভানেত্রী, আর তা ছাড়া একাধিক কর্ম্ম-পরিচালিকা ও জন-বাবো সদস্য আছেন। কার্য্যকরী সভা মাসে একবার ক'রে সমবেত হয়, আর তা'তে কার্য্যাবলী ও হিসাবপত্র নিয়ে কথা হয়।

সাধারণ সদস্যদের সভা দু'মাসে একবার ক'রে হয। সদস্যরা মহিলা, তাঁদের যাওয়া-আসার গাড়ীভাড়া সমিতি থেকেই দেওযা হয, নইলে কেউ আস্‌তে চান না। কাজেই টাকা কম ব'লে সাধারণ সভা দু'মাসে একবারের বেশী হ'তে পারে না। এই সাধারণ সভাগুলি বেশীর ভাগ কেবল পরস্পর মেলামেশা কব্‌বার জন্য, কিন্তু তা হ'লেও সমিতির উদ্দেশ্য সেই সঙ্গে-সঙ্গে কিছু-কিছু শিক্ষা দেওযা, এবং এইজন্য যা সকলের ভালো লাগে এমন বিষয়ে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে আলোচনা করাটা এইসব মেলামেশার সভার একটি অঙ্গ, আর এটাতে সকলে খুসীও হন। বাঁকুড়ার সমিতি তাঁদের বিগত সাধারণ সভায় শ্রীযুক্তা বেণ্টলীর সিনেমা ফিল্‌ম্ দেখবার ব্যবস্থা করেছিলেন, এবং আমি শুন্‌লাম এটি মহিলাদের কাছে খুব চমৎকার লেগেছে। সহরের হাঁসপাতালগুলিতে সমিতি থেকে রান্নার বাসন ও পিতলের থালা বাটী ঘটী সব দান করা হ'য়েছে—হাঁসপাতালে এসব কিছু ছিল না, সমিতি থেকে এসব জিনিষ দান করার আগে গরীব রোগীদের শালপাতা আর মাটির ভাড়ে ক'রে খাবার দেওয়া হ'ত। রোগীদের জন্য কিছু আসবাব পত্র, কাপড়চোপড় আর খাবার জিনিস সমিতি থেকে দান করা হ'য়েছে। সহরে যত বিদ্যালয় আছে, মেডেল ও পারিতোষিক দিয়ে সমিতি তাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। সমিতি দাইদের

শিক্ষা দিবার ভার নিয়েছেন—কাজটি কঠিন, কিন্তু অতি আবশ্যক! সম্প্রতি সমিতি থেকে একটি শিশুমঙ্গল চিকিৎসালয় স্থাপন করার কথা হ'য়েছে। আমার দৃঢ় ধারণা যে যদি প্রত্যেক জেলার সদরে ও ক্রমে-ক্রমে প্রত্যেক গ্রামে এইরূপ একটি ক'রে মহিলা-সমিতি থাকে, তা হ'লে দেশে অনেক ভালো কাজ করতে পারা যায়।

"বঙ্গীয় মহিলা-কেন্দ্র-সমিতি" নাম দিয়ে একটী প্রতিষ্ঠান কল্‌কাতায় হওয়া উচিত, এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কর্ম্মী মেয়েদের মধ্যে থেকে হওয়া চাই।

এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের একটি কার্য্যকরী সভা থাক্‌বে, তা'তে জন ছয় সদস্য একজন সভানেত্রী, ও আবশ্যকমত একজন বা দু'জন কর্ম্মসচিব থাকবেন। এই প্রতিষ্ঠান, কি ক'রে মহিলা-সমিতি গ'ড়ে তুল্‌তে হয়, সে বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে খবর ও পরামর্শ দেবেন, বক্তৃতা দেবার লোক পাঠাবেন, আদর্শ নিয়মাবলী ও যা'তে সাহায্য হয় এমন পুস্তিকা প্রভৃতি পাঠাবার জন্য ও আবশ্যক হ'লে সুযোগ্য বিজ্ঞানবিৎ প্রদর্শক বা বক্তা (সম্ভব হ'লে ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবি-সমেৎ) যোগাড় করতে সাহায্য করবেন। এক কথায় এই কার্য্যটীতে সাধারণভাবে সব বিষয়ে উৎসাহ দেবার জন্য "মহিলা-কেন্দ্র-সমিতি" প্রস্তুত থাকবেন, কিন্তু নিজেদের কাজ চালানোর বিষয়ে নিজের টাকা-কড়ির ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে, এবং স্থান ভেদে সদস্যরা যে-কাজকে সকলের চেয়ে উপযোগী মনে ক'রে করতে চাইবেন, সেই কাজ আরম্ভ করা সম্বন্ধে শাখা মহিলা-সমিতিগুলি নিজের মত-অনুসারে চল্‌বেন। কেউ যদি কোনো বিশেষ জেলার সদরে বা গ্রামে মহিলা-সমিতি স্থাপন করতে ইচ্ছা করেন, তাহ'লে তিনি মহিলা-কেন্দ্র-সমিতির সাধারণ কর্ম্মসচিবকে পত্র লিখে' জানাবেন, তখন কর্ম্মসচিব পত্রলেখককে সেই প্রদেশস্থ মহিলা-সমিতির উদ্দেশ্যের প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত স্থানীয় সভার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন।

প্রথম প্রথম উপযুক্ত মহিলা-বক্তা পাঠানো সম্ভব না হ'তে পারে, কিন্তু পুরুষ-বক্তাদের বক্তৃতা শুনতে আপত্তি করবেন না, এমন মহিলা-সমিতি আছে আমি জানি। স্বাস্থ্য-বিভাগের প্রধান রাজকর্ম্মচারীর কাছে আবেদন করলেই, যখনই কোনো মহিলা-সমিতির আবশ্যক হবে তখনই তিনি বক্তা পাঠিয়ে ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবি দিয়ে এবং আরো অন্য উপায়ে সাহায্য করতে পারবেন। বাঁকুড়া মহিলা-সমিতি যখনি স্বাস্থ্য-বিভাগের ডাইরেক্টর-মহাশয়কে এক চিঠি লিখেছেন, তখনি তিনি বেশ সুযোগ্য একজন বক্তাকে বেশ চিত্তগ্রাহী আর শিক্ষাপ্রদ ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবি দিয়া সম্পূর্ণরূপে বিনা-খরচায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। এইসব

বিষয়ে মহিলা-সমিতি গুলিকে খবর দেবার কিম্বা স্বাস্থ্যবিভাগের ডাইরেক্টরের কাছ থেকে বক্তা ও ম্যাজিক লণ্ঠন পাঠাবার ব্যবস্থা করবার ভার কেন্দ্র-সমিতি গ্রহণ করতে পারেন। *

সরোজনলিনী দত্ত।

---

* "সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল-সমিতি" এখন এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

মহিলা-সমিতির গঠন-প্রণালী

সরোজনলিনীর জীবনী পাঠ করিয়া হয়ত অনেকে মহিলা-সমিতি গঠন করিতে ইচ্ছুক হইবেন। তাঁহাদের অবগতির জন্য বাঁকুড়া মহিলা-সমিতির নিয়মাবলী ও সরোজনলিনীর স্থাপিত মহিলা-সমিতি গুলির কার্য্য প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) বাঁকুড়া মহিলা-সমিতির নিয়মাবলী।

বাঁকুড়া অন্তঃপুরমহিলা-সমিতি

(প্রতিষ্ঠিত ৯ই শ্রাবণ সন ১৩২৯)

সভানেত্রী—শ্রীমতী সরোজ-নলিনী দত্ত, এম, বি, ই,

সহযোগী সভানেত্রী—
- শ্রীমতী নলিনী রায়
- " মনোশোভা বাগ্‌চি
- মিসেস্ এ, ই, ব্রাউন
- " কে, বি, দে

সম্পাদিকা—শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী চট্টোপাধ্যায়

সহযোগী সম্পাদিকা—
- শ্রীমতী শান্তবালা বন্দ্যোপাধ্যায়
- " লীলাবতী রাহা
- " শৈললতা চক্রবর্ত্তী
- " লীলাবতী বন্দ্যোপাধ্যায়

কার্য্যকরী সভার সভ্য—
- শ্রীমতী শৈলবাসিনী চট্টোপাধ্যায়
- " ইন্দুমতী মুখোপাধ্যায়
- " সন্তোষ কুমারী দেবী
- " শ্রীমতী বিশ্বাস
- " বিভাবতী ঘোষ
- " নীরজা বসু
- " নীরজাবালা হাজরা
- " নবনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়
- " নিধুবালা দত্ত

উদ্দেশ্য—বাঁকুড়ায় স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি। মহিলাদের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপন ; হাঁসপাতালে এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য ও দান, অন্তঃপুর-শিক্ষা ও অন্তঃপুর-শিল্পের বিস্তার, ও অন্তঃপুর-স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা।

বাঁকুড়া জেলার সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন মহিলা এ সমিতির সভ্য হইতে পারেন।

বার্ষিক চাঁদার হার এক টাকা বা তদূর্দ্ধ, অর্থাৎ যে কোন সভ্য ইচ্ছা করিলে এক টাকার বেশী দিতে পারেন।

কয়েকটী উৎকৃষ্ট স্ত্রীপাঠ্য মাসিক পত্রিকা ও স্বাস্থ্যনীতি প্রভৃতি পুস্তিকা বা গ্রন্থ সমিতি হইতে সভ্যদিগের পাঠের জন্য বিলি করা হইবে।

বার্ষিক চাঁদা ভাদ্র মাসের মধ্যে দেয়।

সম্পাদিকা টাকা সংগ্রহ করিবেন এবং তাহা পোষ্ট আফিসে অথবা ব্যাঙ্কে জমা রাখিবেন।

বৎসরের শেষে সাধারণ-সভার অধিবেশনে আগামী বৎসরের কার্য্যকরী সভার সভ্য, সম্পাদিকা ও সভানেত্রী মনোনীত করা যাইবে।

কার্য্যকরী সভার অধিবেশনে সম্পাদিকা আয় ও ব্যয়ের হিসাব দিবেন। কার্য্যকরী সভার অনুমোদন ব্যতীত সমিতির কোন টাকা খরচ করা হইবে না।

কার্য্যকরী সভা আবশ্যক মনে করিলে সমিতির জন্য এক বা ততোধিক বাংলা মাসিক পত্রিকা আনাইতে পারিবেন এবং তাহা সম্পাদিকা পর্য্যায়-ক্রমে সভ্যগণের মধ্যে প্রচার করিবেন।

(১) মহিলা-সমিতির কার্য্য-প্রণালী।

মহিলা-সমিতির সাধারণ সভ্যদের অধিবেশন সমিতির কোন সভ্যের নিমন্ত্রণে, তাঁহার বাড়ীতে অথবা টাউনহল ইত্যাদি স্থানে ৩।৪ মাসে একবার করিয়া করা হইত। ৮।১০ জন সভ্য নিয়া একটি কার্য্যকরী-সমিতি গঠন করা হইত। এই কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন মাসে একবার করিয়া হইত। মহিলা-সমিতির কি কি কার্য্য কি প্রণালীতে হইবে এবং তাহাতে কত খরচ হইবে ও কি করিয়া খরচ বহন করা হইবে ইত্যাদি বিষয় কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনে স্থির হইত। সাধারণ অধিবেশনে মহিলাদের যাতায়াতের জন্য গাড়ীর বন্দোবস্ত ও তাহার ব্যয়-বহন সমিতি হইতে করা হইত। কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনে

মহিলারা আপনারাই গাড়ীর বন্দোবস্ত করিযা আসিতেন। সাধারণ অধিবেশনের একখানা নিমন্ত্রণ-পত্রের নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল:—

"সুহৃদ্‌ববাসু—

"আগামী ৩রা এপ্রিল মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকাব সময আমার বাড়ীতে সিউড়ি মহিলা-সমিতির দ্বিতীয অধিবেশন হইবে। আপনি এবং আপনার পরিবারস্থ মহিলাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই অধিবেশনে যোগ দান করিলে আমি পরম আপ্যাযিত হইব। পর্দ্দার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইবে। ইতি।

"কালেক্টর কুঠি,
"সিউড়ি।
"২১শে মার্চ্চ ১৯১৭।

"প্রীতিবদ্ধা
"সবোজনলিনী দত্ত।

"পুনশ্চ—এই অধিবেশনে সমিতির আগামী বৎসরের কার্য্যপ্রণালী আলোচিত হইবে। মহিলাদিগের যাতাযাতেব জন্য সমিতি হইতে গাড়ীর বন্দোবস্ত করা হইবে।"

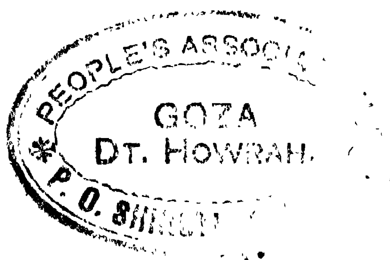
সাধাবণ সমিতির অধিবেশনে প্রায়ই কলিকাতা ইত্যাদি নানা স্থান হইতে বিখ্যাত বক্তা আনাইযা স্বাস্থ্যোন্নতি, শিল্পবিস্তাব ইত্যাদি সম্বন্ধে ছাযাচিত্রের সাহায্যে বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা হইত, এবং কখন কখন স্থানীয় লেডীডাক্তার অথবা অন্যান্য সুযোগ্যা মহিলা কোন বিশেষ বিষযে প্রবন্ধ পাঠ করিতেন, হাঁসপাতাল ইত্যাদিতে দাতব্য জিনিস পত্রাদি প্রদর্শিত হইত,অথবা বালিকা বিদ্যালয়ের মেযেদিগকে বন্ধন ও গৃহশিল্প বিষযে পারদর্শিতার জন্য পারিতোষিক দেওয়া হইত।

বাঁকুড়া মহিলা-সমিতির প্রত্যেক সভ্যের বাড়ীতে সবোজনলিনী এক একটি ভাণ্ড রাখিযাছিলেন। সে সব ভাণ্ডে সভ্যেরা প্রত্যহ এক বা ততোধিক মুষ্টি চাউল বাখিতেন। সেই চাউলগুলি মাসের শেষে একসঙ্গে সংগ্রহ কবিযা মাসে প্রায ৪।৫ মণ চাউল পাওয়া যাইত। স্থানীয় জনৈক চাউল ব্যবসাদারের সঙ্গে চাউল সুবিধা দবে বিক্রযের বন্দোবস্ত ছিল, তাহা হইতে মাসে ২২৲।২৩৲ টাকা উপলভ্য হইত।

এতদ্ব্যতীত সমিতির মেম্বরগণ প্রতিমাসে রুমাল, জামা ইত্যাদি বুনিয়া সমিতির সাধারণ অধিবেশনে সমিতিকে উপহার দিতেন। সাধারণ অধিবেশনেই অন্যান্য মেম্বরগণ আগ্রহ করিয়া সেগুলি উপযুক্ত দামে কিনিয়া লইতেন।

এই সব চাউল ও অন্যান্য দ্রব্য-বিক্রয়-লব্ধ টাকা হইতে প্রতিমাসে ২০৲।২৫৲ টাকা স্থানীয় হাসপাতালে রোগীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দুধ, ফল, মাছ, মাংস ইত্যাদি দ্রব্য কিনিবার উদ্দেশ্যে পাঠান হইত; এবং হাসপাতালের ডাক্তার তাহার হিসাব রাখিবার জন্য একটা আলাদা খাতা রাখিতেন ও সেই হিসাবের নকল প্রতিমাসে মহিলা-সমিতির জ্ঞাপনার্থে পাঠানো হইত।

মহিলা-সমিতির চাউল সংগ্রহ ইত্যাদির হিসাব সরোজনলিনী নিজ হাতে সযত্নে রাখিতেন। তাঁহার মহিলা-সমিতির হিসাবের খাতার তিন পৃষ্ঠার প্রতিলিপি পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল:—



মহিলা সমিতির হাসপাতাল ফান্ড

খরচ - এপ্রিল

শিশু বাবুকে হাসপাতালের লণ্ঠনের জন্য ৫৲
দিদির হাতে আনন্দমোহিনীকে — ২৮৲
এখন কাঠ হাসপাতালের জন্য — — ২৷৷৵৹
বেড়ী কাটা " " " — — ।৵
তারক বর্মণ " " — ।৵
শ্রীমতী [illegible] চক্রবর্তী
দান - [illegible] জন্য — ৯৲

৩৭।০ [illegible]

মে মাসে খরচ

লোহার নতুন হাসপাতালের নাম লেখাইতে
[illegible] — ৯ [illegible]
হাসপাতালের কাপড়ের জন্য [illegible] [illegible]
হাসপাতালের আনন্দমোহিনীকে দেওয়া [illegible]

[illegible]

সরোজনলিনার নেতৃত্বে বীরভূম মহিলা-সমিতির কার্য্যের সংক্ষিপ্ত-বিবরণী।

—:০:—

সৈন্যদের অভ্যর্থনা—

বীরভূম জেলায় সৈন্য সংগ্রহের জন্য যে কয়েকটী বাঙ্গালী সৈনিক আসিয়াছিলেন, মহিলা-সমিতির কয়েকজন সভ্য মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা ও আহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহিলাগণ স্বহস্তে রান্না ও পরিবেশন করিয়াছিলেন, এবং আহারান্তে সৈনিকদিগকে সম্রাটের ও দেশের কাজে জীবন পণ করিয়া জয়ী হইতে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন তাহাদের প্রত্যেককেই কিছু উপহার দেওয়া হইয়াছিল।

পত্রিকা ও গ্রন্থপ্রচার—

সিউড়ি সহরের সভ্যাদিগের মধ্যে ভারতবর্ষ, ভারতী, মানসী, প্রবাসী, স্বাস্থ্যসমাচার প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা, সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটী দুইখানি করিয়া ও স্বাস্থ্যনীতি, কলেরা, যক্ষ্মা প্রভৃতি বঙ্গীয়-হিতসাধন-মণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা ও অন্যান্য সুরুচি সম্মত গ্রন্থ সমিতি হইতে সভ্যাদিগের পাঠের জন্য পর্য্যায়ক্রমে বিলি করার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। মহিলাগণ সকলেই উৎসাহের সহিত ঐ সকল পত্রিকা, পুস্তিকা ও গ্রন্থ পাঠ করিয়া উপকৃত হইয়াছিলেন।

সিউড়ি মধ্য-ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ের বালিকাদিগকে রান্না, সেলাই ও গৃহস্থালীর হিসাব শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান—

সমিতির দ্বিতীয় বর্ষে সমিতির ছয় জন সভ্য সিউড়ি বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের রন্ধন ও সেলাইয়ের কাজে নিপুণতার পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন. পরীক্ষার ফল অনুসারে ছয়টী বালিকাকে রৌপ্য-পদক, সেলাইয়ের বাক্স ও পুস্তক পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল।

সমিতির তৃতীয় বর্ষে ১৩২৬ সালের আষাঢ় মাসে সমিতি হইতে সিউড়ি বালিকা-বিদ্যালয়ের রন্ধন, সেলাই ও গৃহস্থালীর হিসাব সম্বন্ধে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সারি সারি ইষ্টক-নির্ম্মিত উনানে ছোট ছোট ৮।৯ বৎসরের মেয়েরা হাতা, হাঁড়ি, খুন্তি, কড়া প্রভৃতি লইয়া যেরূপ নিপুণতার সহিত ভাত, ডাল ও আলু

পটলের ডালনা রান্না করিয়াছিল তাহা বস্তুতঃই দেখিবার জিনিষ হইয়াছিল। বালিকাদের রান্না করা খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ গ্রহণ করিয়া ও রান্নার প্রণালী পরিদর্শন করিয়া উক্ত পরীক্ষার ফল নির্ণয় করা হইয়াছিল।

সমিতির সহযোগী সভাপতি শ্রীমতী সরোজনলিনী দত্ত, এম, বি, ই, সমিতির সভ্য মিসেস্ মেটা, শ্রীমতী সরোজিনী দেবী, ও শ্রীমতী সুরবালা এবং সম্পাদিকা শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা রায় বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকিয়া পরীক্ষা পরিচালনের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সমিতির সভ্য ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী কুমারী জীবনবালা দে চৌধুরী সবিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া পরীক্ষাগ্রহণে সহায়তা করিয়াছিলেন, অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীগণও পরীক্ষা গ্রহণে সহায়তা করিয়াছিলেন। পরীক্ষার ফল অনুসারে বালিকাদিগকে রৌপ্য পদক, ক্যাশ বাক্স, রেশম ও সূঁচসহ মকমলের ব্যাগ, সেলাইয়ের বাক্স, পিতলের হাতা, খুন্তী, কড়া, পিতলের বাটা ইত্যাদি পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল।

অন্তঃপুর-শিক্ষায় উৎসাহ দান—

মহিলা-সমিতির সহযোগী সভাপতি শ্রীমতী সরোজনলিনী দত্ত মহোদয়ার বিশেষ চেষ্টায় ও সমিতির কতিপয় সভ্যের সহায়তায় সিউড়ি ডাঙ্গাল পাড়ায় অন্তঃপুর শিক্ষার একটী কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল এবং অন্তঃপুরবাসিনী শিক্ষয়িত্রীদের দ্বারা শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদিগের যাতায়াতের গাড়ীভাড়ার অধিকাংশই সমিতি বহন করিতেন।

হাঁসপাতালে সাহায্য—

সমিতির সভ্যগণ তিনবার জেনানা হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিয়া রোগীদের অভাব অসুবিধা জানিয়া তাহা মোচন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথম বারে রোগীদের জন্য ১২খানি সাড়ী, ৬খানি কম্বল ও ২খানি বিছানার চাদর দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয় বারে রোগীদের ২খানি খাট মেরামত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল ও হাঁসপাতালের একান্ত প্রয়োজনীয় অস্ত্রাদি ও শয্যোপকরণ ক্রয় করিতে জেনানা হাঁসপাতালের সম্পাদক সিভিল সার্জ্জনের হস্তে ১৮১৲ টাকা দেওয়া হইয়াছিল। তৃতীয় বারে সিউড়ির জেনানা ও পুরুষদের হাঁসপাতালের রোগীদের স্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় কোয়ার্টারের [illegible] ৮০৲ টাকা সিভিল সার্জ্জনের হস্তে দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে প্রতি কোয়ার্টারে নিয়মিতরূপে ৩০৲ টাকা দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছিল।

অন্যান্য জনহিতকর কার্য্য—

তৃতীয় বর্ষে বীরভূম জেলার দুঃস্থলোক, বিশেষতঃ দুঃস্থা স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিতরণের জন্য সমিতি, কলিকাতা মহিলা সমিতি হইতে ৩০০ খানি বস্ত্র প্রাপ্ত হন। বিভিন্ন থানার দুঃস্থ লোকদের মধ্যে তাহা বিতরণ করা হইয়াছিল। যাহাদিগকে বস্ত্র দেওয়া হইয়াছিল তাহারা অধিকাংশই স্ত্রীলোক।

সমিতির সহযোগী সভাপতি শ্রীমতী সরোজনলিনী দত্ত মহোদয়া প্রথম বর্ষে ১২৫৲, দ্বিতীয় বর্ষে ২৬৫৲ ও তৃতীয় বর্ষে ১৬৫৲ সংগ্রহ করিয়া "লেডী হার্ডিঞ্জ্ লিনেন লিগে' প্রেরণ করিয়াছিলেন তজ্জন্য প্রতিবারেই "লিগ্' হইতে কম্বল, বিছানার চাদর, বালিশের খোল, তোয়ালে প্রভৃতি কাপড় পাওয়া গিয়াছিল। তাহা সিউড়ির দুইটী হাঁসপাতালে এবং রামপুর হাট ও বোলপুরের হাঁসপাতালে দেওয়া হইয়াছিল।

যুদ্ধ-সম্পর্কে সাহায্য--

সহযোগী সভাপতি শ্রীমতী সরোজনলিনী দত্ত মহোদয়া 'সখের বাজার' খুলিয়া ১৮১০৲ টাকা সংগ্রহ করেন, তন্মধ্যে লেডী কারমাইকেল যুদ্ধ ভাণ্ডারে ১২৬০৲ টাকা ও বেঙ্গল অ্যাম্বুলান্স্ কোরের সাহায্যার্থে ৫৫০৲ টাকা প্রেরণ করা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সমিতির চেষ্টায় যুদ্ধ সম্পর্কে বাঙ্গালী সৈন্যদের স্বাচ্ছন্দ্যের "আমাদের জন্য দিন' উপলক্ষে ও মহামাননীয় সম্রাট্ ও মহামাননীয়া সম্রাজ্ঞীর বিবাহের "রজত জুবিলী উপলক্ষে ১৫৫২৲ টাকা সাহায্য প্রেরণ করা হইয়াছিল।

সৈনিকদিগের জন্য উপহার ও আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রেরণ—

ভারতীয় সৈনিকদের জন্য গামছা ১৭৮ খানা, সিগারেট ১২ প্যাকেট সমিতির সভ্যগণের নিজের হাতে কাটা ও সেলাইকরা পঁচিশিখেলার ছক ৪৯ খানা, রুমাল ৩০৬ খানা, তোয়ালে ১১৩ খানা, এবং ছোট আয়না ২২০ খানা, ক্রিকেট সেট ১টি, অতিরিক্ত ব্লাডারসহ ফুটবল ১টি, গ্রামোফোন ১টি, রেকর্ড ৬টি, গ্রামোফোনের পিন ১ বাক্স, ইংরেজী পত্রিকা ৪বাণ্ডিল, দাঁতন ১০ বস্তা, তেঁতুল ২ মণ, সুপারি আধমণ, এলাচ আধমণ ও লবঙ্গ ১০ সের প্রেরণ করা হইয়াছিল।

বীরভূম জেলা হইতে যে সব যুবক সৈন্যদলভুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য পশমী দস্তানা ১ জোড়া, টার্কিশ তোয়ালে ১ থানা, রুমাল ১ খানা, পিয়ার্স সোপ ১ খানা,

সেলুলয়েড্ টুথব্রাস্ ১টি, কার্ব্বলিক্ টুথ্ পাউডার্ ১ কৌটা, ও নববর্ষের আশীষপত্র ১ খানা প্রেরিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালী সৈন্যদের 'এ' কোম্পানির জন্য এক সেট হকি প্রেরিত হইয়াছিল।

বীরভূমে সৈন্যসংগ্রহের জন্য কয়েকজন বাঙ্গালী সৈন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পশমী দস্তানা ১ জোড়া, টার্কিশ তোয়ালে ১ খানা, রুমাল ১ খানা, পিয়ার্স সোপ ১ খানা, সেলুলয়েড্ টুথব্রাস্ ১ টি, কার্ব্বলিক্ টুথপাউডার্ ১ কৌটা ও নববর্ষের আশীষপত্র ১ খানা উপহার দেওয়া হইয়াছিল।

সৈন্যদের জন্য পোষাক-পরিচ্ছদ সেলাই—

যুদ্ধের সময় লেডী কারমাইকেল যুদ্ধ-ভাণ্ডার হইতে সৈনিকদিগের ব্যবহারার্থ যে সব পোষাক পরিচ্ছদ প্রতিমাসে সেলাইয়ের জন্য প্রেরিত হইত সমিতির সভ্যগণ তাহা সেলাই করিয়া দিয়াছেন। ১৯১৬ সনের ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯১৮ সনের নভেম্বর পর্য্যন্ত সভ্যগণ রুমাল ১১৬২ খানা, সার্ট ৯৭০ খানা, তোযালে ৬৮১ খানা, পাজামা ৬৭৫ খানা, ঝাড়ন ৩১৬ খানা, বালিশের খোল ২১৯ খানা, রাত্রিতে পরিধেয় পোযাক ৭০ খানা, সিল্ক পাজামা ৭০ খানা, মশারি শিরস্ত্রাণ ৭০ খানা, বাটীর ঢাকনা ৬০ খানা, স্পাইন্ প্যাড্ ৫০ খানা, ঔষধের কাপড (Medicine Cloth) ৬০ খানা, বিছানার পকেট (Bed pockets) ৩২ টি, ময়লা কাপড় রাখিবার ব্যাগ্ ২০ টি, স্নানের দস্তানা ২০ টা, বালির ব্যাগ ১২ টী, বিছানার চাদর ১২ খানা, গলাবন্ধ ১২ টি খাকিসার্ট ১০ টি, একুনে ৪৪৮৯ খানা জিনিস সেলাই করিয়া লেডী কারমাইকেল যুদ্ধভাণ্ডারে পাঠাইয়াছিলেন।

"আমাদেব দিন" (Our Day)—

"আমাদের দিনে" সমিতির সহযোগী সম্পাদিকা শ্রীমতী প্রভাবতী দেবীর গৃহে সম্ভ্রান্ত পরিবারের অল্পবয়স্ক বালকবালিকারা "শৈব্যা", "অশোক বনে সীতা" ও "প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ" অতি সুন্দররূপে অভিনয় করিয়াছিলেন। কেবল মহিলাগণই অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীনগেন্দ্রবালা রায়।

সম্পাদিকা, বীরভূম মহিলা-সমিতি॥

সরোজনলিনীর নেতৃত্বে বাঁকুড়া মহিলা-সমিতির কার্য্যের সংক্ষিপ্ত-বিবরণী।

—:০:—

শিক্ষা—

অন্তঃপুর-বাসিনী মহিলাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য সহরের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে ৬টি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। স্কুলে যাবার পক্ষে যে সব মেয়েদের ও বৌয়েদের বয়স বেশী, তাদের জন্য এই সব কেন্দ্রে বিনা বেতনে অন্তঃপুর-শিক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে যখন সাংসারিক কাজ সাধারণতঃ কম থাকে এবং মেয়েরা গল্পগুজবের জন্য যখন পাড়ার কোন সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীতে একত্র হন, সেই সময় ও সেই সকল বাড়ীতে এইরূপ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। অন্তঃপুর-শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী চক্রবর্ত্তী প্রত্যেক কেন্দ্রে সপ্তাহে দুই দিন করিয়া পাঠ, হস্তলিপি, অঙ্ক, সেলাই ও স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন। এই সব কেন্দ্রে খুব সহজভাবে মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইয়া তাহাদের নিরক্ষরতা মোচন করার চেষ্টা হইতেছিল।

গভর্ণমেণ্ট এই অন্তঃপুর-শিক্ষয়িত্রীর বেতন বাবদ মাসে মাসে ৬০ টাকা করিয়া দিতেছেন এবং মিউনিসিপালিটী মাসে মাসে তাঁহার যাতায়াতের গাড়ীভাড়ার জন্য ২০৲ টাকা করিয়া দিতেছেন। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে ছাত্রী বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন সমিতি হইতে তাহাকে একটী পদক পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল।

বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের রন্ধনশিক্ষা ও সেলাইশিক্ষার পারদর্শিতার জন্য সমিতির পক্ষ হইতে পুরস্কার দেওয়া স্থির হইয়াছিল। জেলা-স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে "ছেলে-মেয়েদের শিক্ষায় মাতার প্রভাব" সম্বন্ধীয় রচনায় যে প্রথম হইয়াছিল, তাহাকে শ্রীমতী মনোশোভা দেবী ৫৲ টাকা মূল্যের পুস্তক পুরস্কার দিয়াছিলেন এবং যে দ্বিতীয় হইয়াছিল তাহাকে সমিতি হইতে ৩৲ টাকা মূল্যের পুস্তক পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল।

হাঁসপাতালে সাহায্য—

হাঁসপাতালের বোগীদের স্বাচ্ছন্দ্যার ভাব সমিতি হাতে লইয়াছিলেন। সিভিল সার্জ্জনেব সহিত লেখালেখির পব সমিতি হইতে হাঁসপাতালের রোগীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মাসে মাসে ২০ টাকা এই সত্ত্বে দেওযা হইতেছে যে, বোগীদের হাঁসপাতাল হইতে দেয় খাদ্যদ্রব্যের উপরে তাহাদের জন্য রুটী, মাছ, মাংস, দাল, দুধ, আচার, চাটনী এই টাকা দিযা কিনিযা দেওয়া হইবে এবং হাঁসপাতাল কমিটি প্রতিমাসে ইহাব সংক্ষিপ্ত হিসাব সমিতির জ্ঞাপনার্থে পাঠাইবেন এবং সমিতির অন্তঃপুব-মহিলাদিগকে হাঁসপাতাল পরিদশনের সুযোগ দিবেন।

সমিতি যখন জানিতে পারেন যে হাঁসপাতালে একটিও পিতলের বা লোহাব বাসন ছিলনা এবং রোগীদের শালপাতায পথ্য দেওযা হইত, এই অভাব দূর করিবার জন্য সমিতি তখনই সিভিল সার্জ্জনের নিকট হইতে আবশ্যকীয জিনিসের তালিকা আনাইযা বাঁকুড়া সদর হাঁসপাতালে পিতলের থালা ২০খানা, পিতলের বাটী ১০টি, পিতলের গ্লাস ১১টি, পিতলের ঘটি ৬টি, পিতলের ডেকচি (ঢাকনা সহ) একটী বড় ও একটী ছোট, পিতলের গামলা ২টী, পিতলের হাতা একটী বড় ও একটী ছোট, লোহার কড়া ২টী, বেড়ী একটী, তাওয়া একটী, হাতা একটী, খুনতি একটী, কাঠের চাকী একটী, কাঠের বেলুন একটী, পিতলের ঘড়া এক টীন, এবং বাঁকুড়া জেনানা হাঁসপাতালে ড্রেসিং টেবল একটী, চিক ৯খানা, পিতলের থালা ৬খানা, পিতলের গ্লাস ৩টী, জল রাখিবার জালা একটী, ওযাটার প্রুফ কাপড় ২গজ, পিতলের গামলা একটী, হারিকেন লণ্ঠন একটী, পিতলের বালতি একটী, সাড়ী ৪খানা ও আলমারি একটী, কিনিয়া দান করিযাছিলেন।

হাঁসপাতাল-ফণ্ড—

হাঁসপাতালের এই গুরুতর অভাবগুলি এত বৎসর বাঁকুড়ার কোন ভদ্রলোক দূর করিতে পারেন নাই, কিন্তু মহিলা সমিতি প্রথম বৎসরেই এ অভাব মোচন করিতে পারিয়াছিলেন।

হাঁসপাতালে এই সব এককালীন দান ও প্রতি বৎসর সাহায্য করিবার জন্য একটী হাঁসপাতাল-ফণ্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহিলা-সমিতির প্রত্যেক সভ্যের বাড়ীতে এক একটী মাটীর ভাণ্ড রাখা হয় ও সভ্যেরা সে সব ভাণ্ডে প্রত্যহ এক বা ততোধিক মুষ্টি চাউল রাখেন এবং সেই চাউলগুলি মাসের শেষে এক সঙ্গে সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিয়া

বিক্রয়লব্ধ টাকা এই ফণ্ডে রাখা হইতেছে। সমিতির মেম্বরগণ যে সমস্ত জামা ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া সমিতির সাধারণ অধিবেশনে উপহার দেন, অধিবেশনেই সে-সব উপযুক্ত মূল্যে বিক্রীত হইয়া বিক্রয়লব্ধ টাকা হাঁসপাতাল ফণ্ডে জমা হয়।

"লেডী হার্ডিঞ্জ লিনেন্ লীগের" জন্য যে টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছিল এবং পাঠাইতে বিলম্ব হওয়াতে লীগ্ যাহা লইতে পারেন নাই, সে টাকাও উক্ত লীগের সম্মতিক্রমে এই ফণ্ডে জমা হইয়াছিল।

অর্থকরী শিল্পশিক্ষা—

শ্রীমতী সরোজনলিনী দত্ত মহাশয়ার নেতৃত্বে অন্তঃপুর-বাসিনী মহিলাদের শিল্পশিক্ষার জন্য সমিতি হইতে একটী শিল্পশিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। ২০।২২টি ভদ্রমহিলা সেখানে শিল্পশিক্ষা করিতেছেন। এই কেন্দ্রে প্রতি শুক্রবার বৈকাল ৫টার সময় বিনা বেতনে শিল্পশিক্ষা দেওয়া হয়। সাধারণতঃ বিধবারা যাহাতে শিল্পশিক্ষা করিয়া নিজেদের ব্যয়ভার নিজেরা বহন করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা যাইতেছে।

হাঁসপাতাল পরিদর্শন—

সমিতির মেম্বরগণ সভানেত্রী শ্রীমতী সরোজনলিনী দত্ত মহাশয়ার সহিত দুই দিন সদর হাঁসপাতাল ও জেনানা হাঁসপাতাল পরিদর্শনে গিয়াছিলেন এবং ইহার একদিন হাঁসপাতালের জন্য ক্রীত বাসন ইত্যাদি সিভিল সার্জ্জনকে দিয়া আসিয়াছিলেন।

মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল অনুষ্ঠান—

১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সাধারণ অধিবেশনে বাঁকুড়া মিউনিসিপালিটীর ধাত্রীদের শিক্ষা দিবার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছিল। সভানেত্রী সরোজ-নলিনী দত্ত মহাশয়ার প্রস্তাবে বাঁকুড়ায় ধাত্রীদের শিক্ষা দিবার জন্য ও গরীবদের ছেলেদের বিনাব্যয়ে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিবার জন্য—একটী কমিটী গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটীতে স্থানীয় সিভিল সার্জ্জন এবং অনেক সুযোগ্য ডাক্তার ও ভদ্রলোক সভ্যরূপে আছেন।

তাঁহারা, ইতিমধ্যেই যাহাতে বাঁকুড়া সহরের ধাত্রীরা উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া তাহাদের কাজ ভালরূপ করিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং শিক্ষিতা ধাত্রীদিগকে মেডেল দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সমিতি এই কমিটীকে ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

পত্রিকা ও গ্রন্থ-প্রচার—

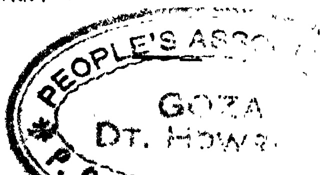
সমিতি হইতে সভ্যাদিগের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় এবং সুরুচি অনুমোদিত গ্রন্থ ও মাসিক পত্রিকা পাঠের জন্য একাদিক্রমে প্রেরিত হইতেছে।

বাঁকুড়া,
৪ঠা অক্টোবর, ১৯২৩।

রাজরাজেশ্বরী চট্টোপাধ্যায়,
সম্পাদিকা, বাঁকুড়া মহিলা সমিতি।

প্রেসিডেন্সী এবং বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্ট্রেস্ কুমারী লিলিয়ান ব্রক্ ১৯২৩ সনের ২৬শে জুলাই তারিখে বাঁকুড়া মহিলা-সমিতি পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন :—

"বাঁকুড়ার জেনানা-শিক্ষয়িত্রী কুমারী শৈললতা চক্রবর্ত্তী বাঁকুড়ার জেনানা মহিলাদের শিক্ষার উন্নতির জন্য যেসব কাজ করিতেছেন, তাহা দেখিয়া আমি বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী শ্রীমতী দত্ত জেনানা-শিক্ষা প্রচারের সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। যাহাতে সমাজের সকল শ্রেণীর নারীগণ শিক্ষালাভ করিতে পারেন, তিনি তাহার সুব্যবস্থা করিতেছেন এবং তিনি ছাত্রীদিগকে বিভিন্ন কেন্দ্রে মিলিত হইতে রাজী করাইয়াছেন ; ইহা অন্যত্র খুব কমই দেখা যায়। মোট ছয়টি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং হাজিরা-পুস্তকে দেখা যায় যে, অনেকেই তাহাতে যোগদান করিয়াছেন। বর্ত্তমানে চারিটি কেন্দ্র আছে এবং ২০।২৫টি ছাত্রী শিক্ষালাভ করিতেছে। জুলাই আগষ্ট মাসে অনেকেই পিত্রালয়ে কিম্বা শ্বশুরালয়ে যান বলিয়া তাঁহারা উপস্থিত হইতে পারেন না। আমার ধারণা, সেপ্টেম্বর মাসে ছাত্রী সংখ্যা পুনরায় বৃদ্ধি হইবে। এখানে অতি উত্তম ও অকৃত্রিম কাজ হইতেছে। শ্রীমতী দত্ত দ্বারা পরিচালিত এই কাজ, স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জনসাধারণের মত জাগরিত করিতে বিশেষ সাহায্য করিবে"।





বাঁকুড়া মহিলা সমিতির অধিবেশন

(টাউন-হলে)

(পরিশিষ্ট) ১৮ পৃঃ

সরোজনলিনীর বাঁকুড়া পরিত্যাগের পর বাঁকুড়া মহিলা-সমিতির কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

—:০:—

সভানেত্রী শ্রীমতী হাজরা তাঁহার বাড়ীতে সমিতির কয়েকজন সভ্যাকে মাননীয়া গভর্ণর-পত্নী লেডী লীটনের সহিত মিলনের জন্য একটী বেসরকারী মজলিসে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মাননীয়া গভর্ণর-পত্নী সমিতি-সম্পর্কীয় কার্য্য দেখিয়া সবিশেষ প্রীতা হইয়াছিলেন।

সভানেত্রী শ্রীমতী হাজরার বাড়ীতে সমিতির একটী সাধারণ সভার অধিবেশনের পর শ্রীমতী বেণ্টলীর "শিশুদিগের ক্রন্দন" বিষয়ক ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল।

বাঁকুড়া মেমোরিয়াল হলে সমিতির এক সাধারণ সভার অধিবেশনে, যেসব ধাত্রীদের শিক্ষার জন্য সমিতি মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন, তাহাদের কাজ পরিদর্শন করিয় তাহাদের মধ্যে ১৩ জন শিক্ষিতা ধাত্রীকে ব্যবসার জন্য আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি পুরস্কারা দেওয়া হইয়াছিল।

আর একটী সাধারণ অধিবেশনে শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার মহাশয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন ও চরকা দ্বারা সুতা কাটিবার প্রতিযোগিতা হইযাছিল। সমিতির সভ্যাদিগের (বিশেষতঃ বয়স্কাদিগের) সুতা কাটিতে মনোযোগ কেমন করিয়া আকর্ষণ করা যায়, সে বিষয়েও আলোচনা হইয়াছিল।

সমিতির সভ্যাগণ শিশুমঙ্গল-প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে (Baby week) একযোগে কাজ করিয়াছিলেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যেরা শিশুমঙ্গল প্রদর্শনীতে এবং ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতার সাহায্য করিয়াছিলেন।

সদর হাঁসপাতালের মাসিক চাঁদা নিয়ম মত দেওয়া হইতেছে। চাঁদা :মাসিক ৮৲ টাকা হইতে ১৯৲ টাকা, গড়ে ১৪৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইতেছে।

ধাই-ট্রেণিং (ধাত্রী-শিক্ষা) ক্লাসের প্রতিষ্ঠা সরোজনলিনীই করিয়া যান, আর শিশু মঙ্গল-কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাবও তিনিই করেন। গত বৎসর বাঁকুড়া-সমিতি এখানকার এই ট্রেণিং-ক্লাসের জন্য যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিয়াছেন। এই টাকার যাহাতে সদ্ব্যয়

হয়, তাহা দেখিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র কমিটী গঠিত হইয়াছিল এবং তাহাতে মহিলা-সমিতিরও কয়েকজন প্রতিনিধি ছিলেন। এই অর্থসাহায্যের দ্বারা ধাইদিগকে দুই রকম শিক্ষা দেওয়া হইতেছে :—

(ক) বাঁকুড়ার মিউনিসিপাল সীমার মধ্যে যে সকল ধাই বাস করে, তাহাদিগকে লইয়া একটী ক্লাস গঠন করা হইয়াছে। প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন করিয়া ক্লাস বসে এবং ডাফ্‌রিন হাঁসপাতালের লেডী-ডাক্তার আসিয়া ধাইদিগের নিকট লেক্‌চার দেন। সপ্তাহে একটী করিয়া মোট দশটী লেক্‌চার দিলে সমগ্র কোর্স শেষ হয়। যে সকল ধাই এই ক্লাসে যোগদান করে, তাহাদিগের প্রত্যেককে প্রত্যেক লেক্‌চার শোনার জন্য চারি আনা করিয়া জলপানি দেওয়া হয়। এইরূপে দশটী লেক্‌চার দেওয়া শেষ হইলে শিক্ষার্থিনী ধাইদিগের পরীক্ষা লওয়া হয এবং যাহারা পরীক্ষায় পাশ হয়, তাহাদিগকে নিম্নলিখিত জিনিষ পুরস্কার দেওয়া হয় :—

১। ডুস্ দিবার পাত্র এবং তৎসংলগ্ন রবারের নল ইত্যাদি। ২। ক্যাথিটার। ৩। নখ পরিষ্কার রাখার জন্য ব্রাস। ৪। এক প্যাকেট্ সাবান। ৫। কাঁচি। ৬। সূতা। ৭। ভ্যাসেলিন্। বলাবাহুল্য, এই সকল দ্রব্যের প্রযোজনীয়তা এবং কিরূপে ইহা ব্যবহার করিতে হয়, তাহা সমস্তই ইহাদিগকে শিখানো হয়।

বাঁকুড়ার মহিলা-সমিতি হইতে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, এই পরীক্ষায় যে সকল ধাই পাশ করিবে, তাহাদিগকে একটী বিশেষ ব্যাজ্ দেওয়া হইবে এবং যখন যেখানে ধাইয়ের প্রয়োজন হইবে, তখন যাহাতে এই ব্যাজধারিণী ধাইদিগকেই ডাকা হয়, সে জন্য সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করা হইবে। গত বৎসর ১৩ জন ধাই এইরূপ পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে।

(খ) জেলা বোর্ড হইতে যে সকল ধাই পাঠানো হয়, তাহাদিগকে তিন মাস ধরিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। এই তিন মাসের খরচ নির্ব্বাহের জন্য প্রত্যেক ধাইকে পূর্ব্বে ৮৲ আট টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইত, কিন্তু উহা যথেষ্ট না হওয়ায় এক্ষণে বাড়াইয়া মাসিক ১০৲ টাকা করা হইয়াছে। ইহাদিগকেও ডাফ্‌রিন হাঁসপাতালের লেডী-ডাক্তার শিক্ষা দিয়া থাকেন। এখনো শিশুমঙ্গল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই, কারণ মিউনিসিপ্যালিটী অথবা জেলাবোর্ড হইতে এখনো আমরা কোনও সাহায্য পাই নাই এবং এইরূপ সাহায্য না পাইলে এই ব্যাপারের প্রাথমিক খরচ নির্ব্বাহ করার সামর্থ্য আমাদের নাই। মহিলা-সমিতি হইতে এই উদ্দেশ্যে প্রাথমিক খরচের জন্য ইতিমধ্যেই একশত

টাকার একটী তহবিল পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। তদ্বাদে কাজ চালাইবার জন্য মাসিক ১৫২ পনর টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং শিশুমঙ্গল কার্য্য চালাইবার জন্য পৃথক একটী কমিটীও গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক সপ্তাহে কোনও একদিন বিকালে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত শিশুমঙ্গল-সমিতির অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছে। কবে এই কার্য্য আরম্ভ করা হইবে, তাহা সঠিক এখনই বলিতে পারিতেছি না; কিন্তু মিউনিসিপালিটী ও জেলাবোর্ডের সভ্য নির্ব্বাচন যখন হইয়া গিয়াছে, তখন আশা হয় যে, শীঘ্রই এই কার্য্য অমরা আরম্ভ করিতে পারিব। মহিলা-সমিতির পক্ষে একাকী সমুদয় ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, সরোজ-নলিনীর স্মৃতিকল্পে আমাদিগকে যে একশত টাকা দান করিয়াছেন, তাহা আমরা গচ্ছিত রাখিযাছি এবং তাহার আয় হইতে শিশুমঙ্গল-সমিতির কোনও সর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ-সবল শিশুকে অথবা সর্ব্বোৎকৃষ্টা ধাইকে একটী পুরস্কার দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে।

গারট্রুড্ ব্রাউন্,

সভানেত্রী, বাঁকুড়া মহিলা-সমিতি!

বীরভূম মহিলা-সমিতির সুলতানপুর গ্রামে অধিবেশনে সরোজনলিনীর অভিভাষণ



আজ আপনারা এখানে এক সঙ্গে মিলিত হ'য়ে আমাকে যে সম্মান দেখালেন, তা'র জন্যে আমি মিসেস্ ব্যানার্জ্জির ও আপনাদের কাছে অত্যন্ত বাধিত। আপনাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

আমার বিষয়ে আপনারা যেসব প্রশংসাসূচক কথা বল্লেন, সে সবের যে আমি যোগ্য, তা ব'লে ত মনে হয় না; তবে আমি যা' কিছু কাজ ক'রেছি এবং তা'তে যে সফলতা লাভ ক'রেছি, সে শুধু আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতিতে হ'য়েছে; আপনাদের সকলের মিলিত সাহায্য ও সহানুভূতি ছাড়া কোন কাজ সম্ভব হ'তে পার্‌ত না—তা' আমি বেশ জানি।

আজ যে আমরা সকলে এখানে মিলিত হ'য়েছি, ইহাই মহিলা-সমিতির উদ্দেশ্যের সফলতা লাভের একটা বিশেষ প্রমাণ।

মহিলা-সমিতির যা' উদ্দেশ্য, তা' বোধ হয় আপনারা অনেকেই জানেন, তবে আমি অল্প দু'এক কথায় সেটা স্পষ্ট ক'রে এখানে বল্‌ছি, কারণ এখানে সমবেত মহিলাদের মধ্যে অনেকেই সমিতির অধিবেশনে আজ প্রথমবার যোগ দিয়েছেন।

সমিতির প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে মহিলাদের মধ্যে মেলামেশা ও সদ্ভাব স্থাপন করা; আমার বোধ হয়, সে উদ্দেশ্যে অনেক সফলতা লাভ ক'রেছি। তা' ছাড়া মহিলা সমিতি একটি খুব প্রয়োজনীয় কাজ ক'র্‌ছে যা' এখানে উল্লেখযোগ্য। সমিতি হইতে তিনখানি বাংলা মাসিক পত্রিকা সভ্যাদিগের পড়্‌বার জন্যে আনান হয় এবং তা' রীতিমত প্রত্যেক সভ্যের বাড়ীতে দু'তিন দিন রেখে তাঁদের পড়্‌বার সুযোগ দেওয়া হয়। এই সকল পত্রিকা পড়ায় যে কত উপকার হয়, বোধ হয় আপনারা সকলেই বুঝ্‌তে পার্‌ছেন। তা' ছাড়া সমিতির অধিবেশনে পারিবারিক স্বাস্থ্যোন্নতি ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা হ'য়ে থাকে।

তারপর সমিতির আর একটা উদ্দেশ্য—মহিলাদের মধ্যে জনহিতকর কার্য্য করা—তাও এ সমিতি অনেক ক'র্‌ছে ও আশাকরি আরও কর্‌বে; যেমন সিউড়ী বালকাবিদ্যালয়ে ও

জেনানা হাঁসপাতালে সাহায্য। বালিকাবিদ্যালয়ের মেয়েদের সেলাই ও রান্না শিক্ষার জন্যে সমিতি হইতে প্রতি বৎসর দু'টি মেডেল ও অন্যান্য পুরস্কার দেওয়া হয়। এ বৎসর তিনটি মেডেল ও অন্য পুরস্কার দেওয়া হ'যেছে। জেনানা হাঁসপাতালেও কাপড় কম্বল ইত্যাদি দেওয়া হ'য়েছে, তা' ছাড়া অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্যে টাকাও দেওয়া হ'য়েছে। সম্প্রতি মহিলা-সমিতি সিউড়ীর দুই হাঁসপাতালে রোগীদের পথ্যাদির জন্যে প্রতিমাসে ১০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হ'য়েছে। তারপর এই ভীষণ যুদ্ধে বীরভূম মহিলা-সমিতি সাধ্যমত যথোপযুক্ত সাহায্য ক'রেছে। অর্থসাহায্য ছাড়া সমিতির অনেক মেম্বর নিজ হাতে কাপড়, জামা এবং পঁচিশি খেলার ছক ইত্যাদিও মাসে মাসে সেলাই ক'রে দিয়েছেন এবং সৈন্যদের জন্যে দাঁতন, গামছা, আরসী, রুমাল, তোয়ালে, গ্রামোফোন ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাঠিয়েছেন। বীরভূম জেলা হ'তে যে সব বাঙ্গালী সৈন্য যুদ্ধে গিয়েছিল, তা'দের জন্যে বিশেষ ক'রে উপহার পাঠান হ'য়েছে। যে সব বাঙ্গালী সৈন্য এ জেলায় এসেছিল, বীরভূম মহিলা-সমিতি ও রামপুরহাট মহিলা-সমিতির অনেক মহিলারা নিজ হাতে রান্না করে তা'দের খাইয়েছেন। যুদ্ধের কাজে সাহায্য করবার পুরস্কার স্বরূপ সমিতির মেম্বর শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা রায়, শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী, শ্রীমতী কুসুমকুমারী দাস এবং আরও দু'টি মহিলা গভর্ণমেণ্ট হইতে ব্যাজ্‌ ও সার্টিফিকেট পেয়েছেন। সমিতির পক্ষে ইহা বড়ই গৌরবের বিষয়।

বীরভূম মহিলা-সমিতি যা' কাজ ক'রেছে ও ক'র্‌ছে তার জন্যে আমি সমিতির পক্ষ থেকে বিশেষ করে সম্পাদিকা শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা রায়কে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি; তিনি এই সমিতির কার্য্যে আমাকে যে রকম সাহায্য ক'র্‌ছেন ও যে রকম অক্লান্ত ভাবে কাজ ক'রেছেন ও ক'র্‌ছেন তা'র জন্যে তিনি খুব প্রশংসাযোগ্য। শ্রীমতী প্রভাবতী দেবীও সমিতির জন্যে অনেক কাজ ক'রেছেন, তাঁ'র কাছেও সমিতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তিনি এ জেলা হ'তে চ'লে যাওয়ায় আমরা সকলেই দুঃখিত।

সমিতির যে প্রধান উদ্দেশ্য মহিলাদের মধ্যে জানা-শোনা ও সদ্ভাব স্থাপন করা, তা'তে যে সমিতি বিশেষ কৃতকার্য্য হ'য়েছে, তা' আমরা আজকে বিশেষভাবে বুঝ্‌তে পারছি। মিসেস্ ব্যানার্জ্জির সৌজন্যে ও আতিথ্যের গুণে আজ সহরের মহিলারা, পাড়াগাঁয়ের মহিলাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় কর্‌বার জন্যে পাড়াগাঁয়ে এসেছেন এবং পাড়াগাঁয়ের মহিলারা সহরের মহিলাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার জন্যে এখানে এসে মিলিত হ'য়েছেন। এ রকম সম্মিলনী বোধ হয় বীরভূমের পক্ষে—এমন কি বঙ্গের পক্ষে এই প্রথম।

আমি আশাকরি, প্রতি বৎসর পাড়াগাঁয়ে এ রকম সম্মিলনীর অধিবেশন হ'য়ে মহিলাদের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্যের বিস্তার হ'বে। আজ সুলতানপুরে যে শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তা'র দীর্ঘজীবন কামনা করি এবং আশা করি যে, সুলতানপুরের আদর্শ অবলম্বনে বীরভূমের অন্যান্য বড় বড় গ্রামে এইরূপ শাখা-সমিতি বিস্তৃত হ'বে—যা'তে সমস্ত বীরভূম জেলার মহিলাগণ বীরভূম মহিলা-সমিতির লোক-হিতকর কার্য্যে যোগ দিযে সমিতির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সফল ক'রে তুল্‌তে পারেন।

পরিশেষে আজ এই আনন্দ-উৎসবের দিনে যিনি এই আনন্দ-উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী তাঁ'কে আবার আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের সম্মিলনীর উদ্দেশ্যে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি যে কত কষ্ট, পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার ক'রেছেন, তা' আমাদের মধ্যে অনেকেই জানেন। সম্মিলনীর অধিবেশনের জন্যে এত কষ্ট, পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার ক'রে তিনি তা'র মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়েছেন।

আপনারা আজ সকলে এখানে এসে আমাকে এরূপভাবে অভিনন্দন দিয়ে যে গৌরবান্বিত কর্‌লেন, তা'র জন্যে আমি আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাক্‌বো। বীরভূম মহিলা-সমিতি যদি দীর্ঘজীবন লাভ ক'রে মহিলাদের মধ্যে পরিচয় ও সদ্ভাব স্থাপন ক'রে সমবেত চেষ্টার সাহায্যে উন্নতির পথে অগ্রসর হ'তে পারে, তা'হলেই আমি যা' কিছু চেষ্টা ক'রেছি, তা' সার্থক জ্ঞান কর্‌ব।

আমরা মহিলা, নারীধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন অনুষ্ঠানই আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা একত্র মিলিত হ'য়ে একে অন্যের উপদেশ ও আদর্শের সাহায্যে যা'তে সেই নারীধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদন ক'রে নিজেদের পরিবারের, স্বামী, পুত্র, কন্যা এবং সমাজের মঙ্গল সাধন ক'র্‌তে পারি, পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে মহিলা-সমিতি আমাদের সেই পথে অগ্রসর করুক।

———



বীবভূম মহিলা-সমিতিব অধিবেশন

(পরিশিষ্ট) ১১ পৃঃ

বীরভূম মহিলা-সমিতির প্রতি সরোজনলিনীর বিদায় অভিভাষণ

আমি এখান থেকে চ'লে যাচ্ছি শুনে আপনারা আজ যে এত কষ্ট স্বীকার ক'রে আমাকে বিদায় দেবার জন্যে একটী অধিবেশন ক'রেছেন এবং সকলে তা'তে যোগ দিয়েছেন, এতে আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে, আপনারা আমাকে কত ভালবাসেন। আজ আপনারা আমাকে এরকম ক'রে সম্বর্দ্ধনা ক'রে এত গৌরবান্বিত করলেন, তা'র জন্যে আপনাদিগকে মুখে যথেষ্ট ধন্যবাদ দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

এ জেলাতে আমাদের চার বৎসরের বেশী হ'য়ে গেল। আস্‌বার অল্পদিন পরেই আপনাদের সঙ্গে মেলামেশা হ'য়েছে এবং এই চার বৎসরের মেলামেশাতে আপনাদের সঙ্গে আমার ত অন্ততঃ খুবই একটা বাঁধন হ'য়েছে। আজ যদিও অনেকেই এখানে নাই, যাঁ'রা এই সমিতি স্থাপনের সময় ছিলেন এবং যাঁ'রা তখন হ'তে সমিতির কার্য্যে আমাকে সাহায্য ক'রে এসেছেন, তবু আমি জানি যে, এখানে এখনও আমার অনেক বন্ধু আছেন, যাঁ'রা এই সমিতির মঙ্গল কামনা করেন এবং আমি ভরসা করি যে, আমি চ'লে গেলেও তাঁ'রা সমিতিকে জীবিত রাখ্‌বেন। বীরভূমে আমি আপনাদের সঙ্গে মিলে-মিশে যা' কিছু ক'রতে পেরেছি, সেটা আপনাদের আমার উপর এত ভালবাসা ও নির্ভরতা আছে ব'লেই এবং সেই ভালবাসা ও নির্ভরতার উপর নির্ভর ক'রেই আমি এ সমিতির চির-স্থায়িত্ব আশা ক'র্‌ছি।

এই চার বৎসর আপনাদের কাছে সব কাজে সম্পূর্ণ সহানুভূতি পেয়েছি। অফিসারদের পত্নীদের মধ্যে প্রায় অনেকেই আমাদের এ সমিতির সাহায্য ক'রেছেন, সে জন্য আমি তাঁ'দের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ; কিন্তু এখানকার জমিদার ও উকীলগণের পরিবারস্থ মহিলাদের কাছে তেমন সহানুভূতি পাই নাই বটে, তবে তাঁ'দের মধ্যে যাঁ'দের কাছে পেয়েছি, তাঁ'দের কাছে আমি তাঁ'দের আন্তরিক সাহায্যের জন্য চিরকৃতজ্ঞ থাক্‌ব। আমি এখানে তাঁ'দের কয়জনের নাম উল্লেখ না ক'রে থাক্‌তে পার্‌লুম না।—

শ্রীমতী মৃগনয়না দেবী
শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী দেবী
শ্রীমতী শ্বেতাঙ্গিনী দেবী
শ্রীমতী রাইরাণী দেবী ও তাঁহার বধূমাতা
শ্রীমতী বিজনকুমারী দেবী
শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবী

এঁরা বিশেষ উৎসাহের সহিত মহিলা-সমিতির কাজে সাহায্য ক'রেছেন, এ ক'জনের কাছে আমি আমার প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমাদের মধ্যে যাঁ'রা এখানে আজ আছি কাল নাই, তাঁদের উপর ত এ সমিতি বরাবর নির্ভর ক'র্বে না, তাই উল্লিখিত মহিলাদের সহানুভূতি ও সাহায্য আমরা এ সমিতির পক্ষে বিশেষ দরকার ব'লে মনে করি। আমি ভরসা করি যে, এই সমিতি তা'র নিজের কর্ত্তব্য ক'র্তে থাক্‌বে, আর তা'র ফলে যাঁ'রা এ সমিতির মর্য্যাদা এখনও বুঝ্‌তে পারেন নাই, তাঁ'রাও একে পরে, ২।৪ বৎসর না হয় ১০ বৎসর পরে আদর ক'র্বেনই। যদিও আমাদের সমিতি সিউড়ীতে কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকের কাছে অনাদৃত হ'য়েছে, তবু আমরা যে এই সমিতির সাহায্যে পরস্পর মেলামেশা ও নানা সৎকার্য্যে সাহায্য ক'র্‌তে পেরেছি, একথা সকলকেই বোধ হয় স্বীকার ক'র্তে হবে।

সমিতি যে কি কি কাজ ক'রেছে, তা' গেলবারের অধিবেশনে আমাদের সম্পাদিকা সকলকে জানিয়েছেন, তা' ছাড়া আমাদের সমিতির যে রিপোর্ট ছাপান হ'য়েছে, তা' বোধ হয় আপনারা সকলে পেয়েছেন এবং তা' পড়্‌লেই জানতে পার্‌বেন। আমি ভরসা করি যে, আমি চ'লে গেলেও সমিতি এই সকল সৎকার্য্য ক'র্তে থাক্‌বে। বিশেষ ক'রে বালিকা-বিদ্যালয়ে সমিতি হইতে যে সকল পুরস্কার দেওয়া হ'য়ে আসছে, তা' বরাবর দেওয়া হ'বে এবং রোগীদের খাবারের জন্য হাঁসপাতালে মাসে মাসে ১০৲ টাকা ক'রে দেওয়া হ'বে—এ আশা আমার রইল।

আমাদের সম্পাদিকা শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা রায়কে বিশেষ ক'রে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁ'র কাছে সমিতি বিশেষ কৃতজ্ঞ; তিনি সমিতির উন্নতিকল্পে অনেক সাহায্য ক'রেছেন। শ্রীমতী জীবনবালা চৌধুরীকে অল্পদিন হ'ল সহকারী সম্পাদিকা করা হ'য়েছে এবং আমি আশাকরি, তিনিও সমিতির উন্নতির চেষ্টা ক'র্বেন—এই সময়ের মধ্যে তাঁ'র যে রকম চেষ্টা দেখ্‌ছি, তা'তে তিনি সমিতির অনেক সাহায্য ক'র্তে পারবেন আশা করি।

আমার মহৎ-হৃদয়া বন্ধু শ্রীমতী মৃগনয়না দেবী ও শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী দেবী—এই মহিলা-মিলনমন্দির আমার নামে স্থাপন ক'রে আমাকে তাঁ'দের কাছে চিরকৃতজ্ঞ ক'রেছেন; তাঁ'দের কাছে মুখে ধন্যবাদ প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনারা সকলেই বোধ হয় তাঁ'দের কাছে এই মিলন-মন্দিরের জন্য কৃতজ্ঞ; কারণ এমন জিনিষ বোধ হয় বঙ্গের আর কোন জেলাতেই নেই। আপনারা যদি এই মিলন-মন্দিরে রীতিমত মাসে মাসে মিলিত হ'য়ে সমিতিকে জাগিযে রাখ্‌তে পারেন, তা' হ'লেই এঁদের বদান্যতার প্রতিদান করা হ'বে।

যদিও আমি এ জেলা থেকে চ'লে যাচ্ছি, তবু আপনাদের সঙ্গে এই চার বৎসরের বাঁধন একদিনে কাটাতে পাব্‌ব না, তা' বেশ জান্‌বেন। আমি যেখানেই থাকি, বীরভূমের মহিলা-সমিতির উন্নতি-কামনা আমি চিরদিনই ক'র্‌ব। আপনাদের কাছে আমার এক নিতান্ত আশা ও অনুরোধ যে, আমি চ'লে যাওযার পরও আপনাবা মহিলা-সমিতিটিকে জীবিত রাখ্‌বেন; আর খালি যে জীবিত রাখ্‌বেন তা' নয়, যা'তে মহিলা-সমিতি প্রাণের পূর্ণতার সহিত লোকহিতকর কার্য্যে যোগদান ক'রে দেশের ও বিশেষভাবে দেশের মহিলাদের উন্নতির সাহায্য ক'র্‌তে পারে, আপনারা প্রত্যেকে তাহার চেষ্টা ক'র্‌বেন। আমাদের ক্ষুদ্র সমিতি-মন্দিরকেই একদিন যেন, আমাদের পাশের এই বালিকা বিদ্যালয়ে আজ যা'রা ছোট ছোট মেয়ে তা'রা বড় হ'য়ে, দেশের পূজার মন্দিরস্বরূপ জ্ঞান ক'রে দেশের মহিলাদের ও সমাজের মঙ্গল সাধন ক'র্‌তে পারে—ভগবানের কাছে আমার এই প্রার্থনা।

মহিলা-মিলনমন্দির
সিউড়ী,
৭ই মার্চ্চ, ১৯২০।

বাঁকুড়ায় মহিলা-সমিতি স্থাপন উপলক্ষে সরোজ-নলিনীর অভিভাষণ

সমবেত ভদ্রমহিলাগণ,

বাঁকুড়ায় এসে অবধি আমি আপনাদের সকলের স'ঙ্গ পরিচিত হ'বার জন্যে যারপরনাই ইচ্ছুক ছিলাম, কিন্তু নানাকারণে ইচ্ছা সত্বেও ইতিপূর্ব্বে সুবিধা ক'রে উঠ্‌তে পারি নি। যা'হোক আজ সূর্য্য বাবুর স্ত্রীর অনুগ্রহে আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল, তজ্জন্য আমি তাঁ'র কাছে যারপরনাই কৃতজ্ঞ আছি।

আপনাদের সঙ্গে চারিটি বিষয়ে আজ আমার আলোচনা করবার বড়ই ইচ্ছা।

প্রথম—মহিলাদের মধ্যে যা'তে সদ্ভাব ও মেলামেশা হয় এবং ভালরূপে পরিচয় ও দেখা-সাক্ষাৎ হয়,

দ্বিতীয়—বালিকাদের শিক্ষা ও অন্তঃপুর-শিক্ষা সম্বন্ধে চেষ্টা করা;

তৃতীয়—স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে অন্তঃপুরের মধ্যে চেষ্টা করা;

চতুর্থ—মেয়েদিগকে চরকা এবং অন্যান্য শিল্প শিক্ষা দেওয়া।

আমাদের দেশে মহিলারা অন্তঃপুরে সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকায় পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয়ের বড় সুযোগ ঘটে না, কিন্তু এ'টা যে কত দরকার, তা' বোধ হয় আপনারা সকলেই জানেন। সেজন্য পারিবারিক কাজের ক্ষতি না ক'রে আমরা যা'তে মাঝে মাঝে একত্র মিলিত হ'তে পারি, সে চেষ্টা করা আমাদের উচিত। আলাপ-পরিচয় হ'লে পরস্পরের কাছে নানারকম অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান করা যায়, সেজন্য আলাপ-পরিচয়ের খুব দরকার।

তারপর বালিকাদের শিক্ষা যে খুবই দরকার, তা' আজকাল সকলেই বোধ হয় মান্‌বেন। অনেকে ভাবেন যে, পাশ কর্‌লেই শিক্ষা হয়; কিন্তু সেটা ভুল—পাশ না ক'রেও অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়, নিজের ঘর-সংসার দেখা এবং ছেলে-পিলে ভাল ক'রে মানুষ করাও যায়। ভালরূপ শিক্ষা পেলে ঘর-সংসারের ও সমাজের অনেকরকম উন্নতি করা যায়। সেজন্য চেষ্টা ক'রে ছোট ২ মেয়েদের সকলকে স্কুলে পাঠান আপনাদের সকলের উচিত; কারণ ছেলেকে যেমন শিক্ষা দিলে সে মানুষ হ'য়ে উপার্জ্জন ক'র্‌বে, মেয়েও তেমনি শিক্ষা

পেলে ভালরূপে সংসার চালাতে ও সন্তান পালন ক'র্‌তে পার্‌বে ; সেজন্য ছেলের যেমন শিক্ষার দরকার, মেয়েরও তেমনি শিক্ষার দরকার। যে দেশে মা শিক্ষিতা না হবে, সে দেশের কখনও উন্নতির আশা করা যায় না,—তা' আপনারা সকলেই জানেন। মায়ের কাছেই ছেলে-মেয়ে প্রথম শিক্ষা পায়,—মা যদি অশিক্ষিতা হয়, তা' হ'লে কেমন ক'রে সন্তানের ভাল শিক্ষা হবে? সেজন্য আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ ক'র্‌ছি যে, আপনারা সকলে চেষ্টা ক'রে আপনাদের মেযেদের এবং আপনাদের পরিচিত লোকেদের মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে চেষ্টা করুন, আর যে মেয়েদের বা বৌয়েদের স্কুলে যাবার পক্ষে বয়স বেশী, তা'দের জন্য এখানে অন্তঃপুর-শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হ'য়েছে। সে বিষয় স্কুলের ইন্‌স্পেক্ট্রেস্ মিস্ বোস্ আপনাদের যা' ব'ল্‌বেন, তা' থেকে সব বুঝ্‌তে পার্‌বেন। তিনি কষ্ট ক'রে এখানে আজ এসে অন্তঃপুর-শিক্ষার বন্দোবস্ত ক'রে যাচ্ছেন ;—তা'র জন্য আমরা তাঁ'র কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। গভর্ণমেণ্ট থেকে এখানে মিস্ বোসের সাহায্যে ও চেষ্টায় একজন অন্তঃপুর-শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হ'যেছে। তিনি বিনা-বেতনে অন্তঃপুর-মহিলাদিগকে শিক্ষা দিবেন। স্কুলডাঙ্গা, পোদ্দার পাড়া, কুচ্‌কুচিয়া এবং পার্টপুর—এই চারিটি মহল্লায় চারিটি সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীতে চারিটি কেন্দ্র স্থাপন করা হ'য়েছে। এইসব কেন্দ্রে অন্তঃপুর-শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী শৈললতা চক্রবর্ত্তী মহিলাদিগকে শিক্ষা দিবেন। তিনি আজ এখানে আপনাদের সকলের সঙ্গে আলাপ ও পরিচয় ক'র্‌তে এসেছেন। এ বিষয়ে আপনাদের সকলের সাহায্য, চেষ্টা ও সহানুভূতি পেলেই সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা লাভ করা যা'বে। তারপর স্বাস্থ্যোন্নতি—এ বিষয়ে পুরুষেরা অবশ্য অনেক চেষ্টা ক'রেছেন, কিন্তু কোন জীবের একদিকটা যদি অসাড় হ'যে থাকে, তা' হ'লে কি সে জীবের দ্বারা কোন কাজ সুসম্পন্ন হ'তে পারে? পুরুষেরা যতই চেষ্টা করুন, স্ত্রীর সাহায্য ছাড়া কখনই সম্পূর্ণ সফল হ'তে পার্‌বেন না—তেমনি স্ত্রীলোকদেরও পুরুষের সাহায্য ছাড়া কোন কাজেই সফল হ'তে পারা সম্ভব নয়। সেজন্য সমাজের উন্নতিকল্পে স্ত্রীলোকদের সাহায্য বিশেষ দরকার। সংসারে গৃহিণীই পরিবারস্থ লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি বা অবনতির কারণ। গৃহিণী যদি তাঁ'র সংসারের উন্নতি খোঁজেন, তা'হলে তাঁ'কে পরিবারস্থ সকলে কি খেলে, কেমন ভাবে থাক্‌লে ভাল থাক্‌বে, তা'র চেষ্টা ক'র্‌তে হ'বে। স্বাস্থ্যরক্ষার যে সকল ভাল উপায় আছে, যে গৃহিণী সে সকল উপায় জানেন এবং কার্য্যে পরিণত করেন, তাঁ'রই গৃহে এবং পরিবারে সর্ব্বদা স্বাস্থ্য বিরাজ কর্‌বে। এইজন্যই স্ত্রী-শিক্ষার এত দরকার।

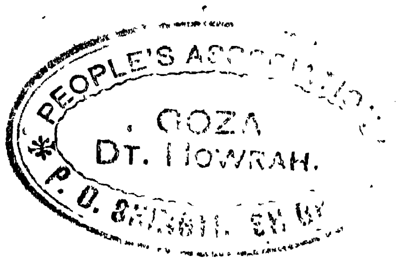
যেদিক থেকেই দেখ্‌বেন এবং যা' কিছু উন্নতি ক'র্‌তে চেষ্টা ক'র্‌বেন, তা'তেই শিক্ষা চাই।

শিক্ষার অভাবেই আজ আমরা অন্য সব দেশের সঙ্গে তুলনায় এত পশ্চাৎপদ। তাই আজ আমাদের একত্র হ'য়ে আমাদের পরিবারের, সমাজের ও দেশের উন্নতি ক'রতে চেষ্টা ক'র্‌তে হ'বে। চর্‌কা কাট্‌তে বা সেলাই শিল্পের কাজ মেয়েরা যা'তে শিখ্‌তে পারে, তা'ও আমাদের চেষ্টা ক'র্‌তে হবে। আমাদের ঠাকুরমারা চর্‌কা কাট্‌তে জান্‌তেন, সুন্দর সুন্দর শিল্পের কাজ সব জান্‌তেন, সেগুলিও আজকাল লোপ পাচ্ছে। সেই সব কাজ অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আজ আমাদের চেষ্টা ক'রে জাগাতে হবে।

এই সব নানা কার্য্য সাধন ক'র্‌তে হ'লে সকলকে একত্র হ'য়ে একে অন্যের উপদেশ ও সাহায্য করা আবশ্যক। তাই আমার মনে হয় যে, বাঁকুড়ায় একটি মহিলা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হওয়া খুব দরকার। তা' হ'লে আমরা এই সমিতির দ্বারা বাঁকুড়ায় স্ত্রী-শিক্ষা, স্বাস্থ্যোন্নতি ইত্যাদি অনুষ্ঠান যা'তে অগ্রসর হয়, তা'র চেষ্টা ক'রতে পার্‌ব। আশাকরি, আপনাদের সকলের একটি মহিলা-সমিতি স্থাপন করা সম্বন্ধে মত আছে।

আজ যাঁ'র ইচ্ছায় আমরা এখানে মিলিত হ'য়েছি, সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের উপর নির্ভর ক'রে এক হ'য়ে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক উন্নতি সাধনের জন্য মহিলা-সমিতি স্থাপন ক'রে তাঁ'রই পায়ে আমাদের মহিলা-সমিতিকে উৎসর্গ করি। তিনিই আমাদের কাণ্ডারী হ'য়ে পথ দেখিয়ে দেবেন।

বাঁকুড়া।
১৩২৯, ৮ই শ্রাবণ।



বাঁকুড়া মহিলা-সমিতির প্রতি
সরোজনলিনীর বিদায় অভিভাষণ

——:০:——

আমি বাঁকুড়া ছেড়ে যাওয়া উপলক্ষে আজ আমাকে আপনারা এখানে আমন্ত্রণ ক'রে যে বিদায় দিতেছেন, তা'তে আপনাদের আমার উপর কতটা প্রীতি ও ভালবাসা আছে, তা' আমি খুব স্পষ্ট উপলব্ধি কর্‌ছি এবং সেজন্য আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা আপনাদিগকে জানাচ্ছি। যে সমিতির সাহায্যে আমি আপনাদের সঙ্গে মেলামেশা, আলাপ-পরিচয় ক'র্‌তে পেরেছি, প্রথমে সেই সমিতির বিষয়ে দু'একটি কথা ব'ল্‌ব। এই সমিতি আমার বড় আদরের জিনিষ—কেননা, এর সাহায্য বিনা আজ আমার আপনাদের সঙ্গে এমনভাবে পরিচয় হ'তে পার্‌ত না।

৯ই শ্রাবণ, ১৩২৯ সালে শ্রীমতী স্নিগ্ধবালা দত্তের বাড়ীতে আমাদের এই অন্তঃপুর-মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মহিলা-সমিতির উদ্দেশ্য আপনারা সকলেই জানেন, কিন্তু সংক্ষেপে মহিলা-সমিতির উদ্দেশ্য এবং তা'র কার্য্য সম্বন্ধে আজ কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না।

মহিলা সমিতির প্রথম উদ্দেশ্য :—মহিলাদের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—অন্তঃপুরের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা ও শিল্পের বিস্তার এবং স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা। তৃতীয় উদ্দেশ্য—হাঁসপাতাল ও অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যে দান ও সাহায্য।

প্রথম উদ্দেশ্যটীতে যে আমরা অনেকটা সফল হ'য়েছি, তা' যাঁ'রা সমিতির ৬টী সাধারণ ও ৪টী কার্য্যকরী অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন, তাঁ'রাই উপলব্ধি ক'র্‌তে পার্‌বেন। সমিতির এই একটী সাধারণ অধিবেশনে অন্ততঃপক্ষে ৭০।৮০ জন থেকে ১০০।১৫০ জন মহিলা একত্র মিলিত হ'য়েছেন। এতগুলি ভগিনী একত্র মিলিত হওয়া সহজ ব্যাপার নয় এবং আমার মনে হয় না যে, সমিতির সাহায্য বিনা তা' সম্ভব হ'তে পার্‌ত। আমার নিজের দিক্ থেকে আমি ব'ল্‌তে পারি যে, সমিতির সাহায্য বিনা আজ আমি আপনাদের সঙ্গে এমনভাবে আলাপ-পরিচয় ক'র্‌তে কখনই সমর্থ হ'তাম না।

আজ যে আপনারা আমাকে এত আদর-যত্ন ক'রে এখানে ডেকে এনেছেন এবং এই

সুন্দর স্মৃতিচিহ্ন দিয়েছেন, তা'র মূলেও এই প্রীতি ও সদ্ভাব আছে। তা' ছাড়া আজ এই এক বৎসর আমরা এতগুলি ভগিনী একত্র যে মেলামেশা ক'রেছি, সেও এই সমিতি হওয়ার ফলে। সমিতি না হ'লে এটা সম্ভব হ'তো কি? একসঙ্গে আমরা যে ১০০।১৫০টী ভগিনী মিলিত হ'য়েছি, এর ফল সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করা যা'ক্ আর নাই যা'ক্, পরে বেশ উপলব্ধি ক'র্‌তে পারবেন।

আগে যাঁ'দের মধ্যে পরিচয় ছিল না, এই সমিতি আজ এই সুযোগটী দিয়েছে। তাই আর কিছুর জন্যে হো'ক আর না হো'ক, শুধু এই সমিতিটী স্থাপনের জন্য আমি চলে গেলেও আপনারা ইহাকে জীবিত রাখ্‌বেন, এই আমার অনুরোধ।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্যেও সমিতি একেবারে বিফল হয়নি। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি দুরূহ কাজ। দুঃখের বিষয়, বাংলা দেশে এখনও অনেক লোক স্ত্রী-শিক্ষার মূলাই উপলব্ধি করেনি। অনেকে বলেন, মেয়েদের আবার শিক্ষার দরকার কি? এটা কিন্তু তাঁ'দের ভুল। যে দেশে মা শিক্ষিত নয়, সে দেশের ছেলে শিক্ষিত হ'তেই পারে না।

আমার অনুরোধ, স্ত্রী-শিক্ষার উপর আপনারা বিশেষ মনোযোগ ও চেষ্টা রাখবেন। সমিতি, স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারকল্পে অন্তঃপুর-শিক্ষাকেন্দ্রে স্বাস্থ্যতত্ত্বের জন্য একটি রৌপ্য-পদক দিতেছে, সেটি আমি আপনাদের কাছে এনেছি। শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ স্বাস্থ্যতত্ত্ব পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করায় এটি তাঁকে প্রদত্ত হ'ল। তা' ছাড়া শিক্ষাকেন্দ্রে যা'তে ছাত্রী বেশী হয় এবং মহিলারা সকলে সে বিষয়ে চেষ্টা করেন, সে জন্য সমিতি সচেষ্ট আছে। মহিলা সমিতির উৎসাহ ও চেষ্টা না থাক্‌লে অন্তঃপুর-শিক্ষা-কেন্দ্রগুলি এমন সুন্দরভাবে চালানো কঠিন হ'ত ব'লে আমার মনে হয়। শিক্ষা বিস্তারের জন্য সমিতি এখনও অনেক কাজ ক'র্‌তে পারে এবং আমি আশা করি ক'রবে।

শিল্পশিক্ষা দিবার জন্যও সমিতি হ'তে একটি শিল্পকেন্দ্র খোলা হ'য়েছে—সেখানকার সমস্ত ব্যয়ভার মহিলা-সমিতি নিয়েছেন। এখন ২০।২২টী ভদ্রমহিলা সেখানে গিয়ে শিল্পশিক্ষা করেন। আশাকরি, আপনাদের সকলের যত্নে ও চেষ্টায় আরও অনেক মহিলারা শিল্পশিক্ষা ক'র্‌তে এখানে আসবেন। বিনাব্যয়ে এমন উৎকৃষ্ট শিল্পশিক্ষার সুযোগ খুব কম ঘটে, কিন্তু এ কথাটি এখনও অনেকে উপলব্ধি ক'র্‌তে পার্‌ছেন না, আশা-করি, অল্পকালের মধ্যে সকলেই উপলব্ধি ক'র্‌বেন।

তারপর স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টার বিষয়েও সমিতি বোধ হয় কতকটা সফলতা লাভ ক'রেছে। মহিলা-সমিতির সাধারণ অধিবেশনে কল্‌কাতা হ'তে একজন সুযোগ্য ও

সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ছায়াচিত্রের দ্বারা স্বাস্থ্য বিষয়ে যে সুন্দর উপদেশ ও বক্তৃতাগুলি দিয়েছেন; সেগুলি কখনই বিফল হ'বে না। আমি শুনেছি ৬।৭ বৎসরের বালিকারাও সেগুলির মর্ম্মগ্রহণ ক'রেছে ও সেগুলি তা'দের ভাল লেগেছে।

হাঁসপাতাল ও অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যে সাহায্যদান বিষয়ে সমিতি যে পশ্চাৎপদ হয় নাই, তা'ও বোধ হয় সকলেই স্বীকার ক'র্বেন। জেনানা হাঁসপাতালে ও সদর হাঁসপাতালে সমিতি ১৫০৲ টাকার পিতলের বাসন এবং অন্যান্য জিনিষ দান ক'রেছে। সমিতির দানের পূর্ব্বে হাঁসপাতালের একটিও পিতলের বা লোহার বাসন ছিল না। রোগীদের শালপাতায় পথ্য দেওয়া হ'ত। এটা কি বাঁকুড়াবাসী উপলব্ধি করেন যে, যে গুরুতর অভাবটি এত বৎসর বাঁকুড়ার কোন ভদ্রলোক মোচন করেন নি, সেই কাজ বাঁকুড়ার মহিলা-সমিতির দ্বারা সম্পন্ন হ'ল? এছাড়া রোগীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সমিতি আজ ৬।৭ মাস রীতিমত মাসিক ২০৲ টাকা ক'রে দিয়ে আস্ছে। এই কুড়ি টাকা সভ্যদিগের সঞ্চিত প্রত্যেক মাসের চা'ল বিক্রীর মূল্য।

এখন আমি সংক্ষেপে সমিতির কার্য্যের কথা বল্লাম। সমিতি যা' কিছু কার্য্য সম্পন্ন ক'রতে পেরেছে এবং ক'র্বে, তা' একজনের চেষ্টায় হয়নি ও হবে না—এই সমিতির কার্য্যে সকলের চেষ্টা না থাকলে আজ আমরা এত সবল হ'তে পার্তাম না। সেজন্য আমি সমিতির সকল সভ্যদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রছি।

যাঁ'রা বিশেষভাবে অর্থ দ্বারা এবং কাজের দ্বারা সাহায্য ক'রেছেন, তাঁদের নাম উল্লেখ না ক'র্লে আমার কৃতজ্ঞতা অসম্পূর্ণ থাকে। নিম্নলিখিত মহিলাদের কাছে আমরা বিশেষ সাহায্য পেয়েছি :—

শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী দেবী। শ্রীমতী লীলাবতী রাহা। শ্রীমতী শান্তবালা দেবী। শ্রীমতী শৈলবালা চক্রবর্ত্তী। শ্রীমতী লীলাবতী দেবী। শ্রীমতী বিভাবতী ঘোষ। শ্রীমতী শৈলবাসিনী দেবী। শ্রীমতী নিধুবালা দত্ত। শ্রীমতী সুহাসিনী দে। শ্রীমতী নবনলিনী দেবী। শ্রীমতী মনোলোভা দেবী। মিসেস ব্রাউন্। মিসেস স্পেন্সার।

নিম্নলিখিত সভ্যগণ সমিতির হাঁসপাতাল-ফণ্ডে কাপড় সেলাই ক'রে দিয়েছেন, তা'র জন্য আমি তাঁ'দেরও আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি :—

শ্রীমতী জীবনমোহিনী রক্ষিত। শ্রীমতী শ্রীমতী বিশ্বাস। শ্রীমতী রেণুপ্রভা গুহ। শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ। শ্রীমতী মনোলোভা বাগচি। শ্রীমতী সুশীলাবালা মিত্র।

শ্রীমতী শান্তলতা ঘোষ। শ্রীমতী বিভাবতী ঘোষ। কোর্ট্ ইন্স্‌পেক্টরের পত্নী। শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ হাজরার কন্যা।

অধিবেশনগুলির বন্দোবস্ত করা ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকজন ভদ্রলোক আমাদের অনেক সাহায্য ক'রেছেন। তাঁ'দের কাছেও আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

সমিতির দ্বারা বাঁকুড়ার আরও অনেক উন্নতি সম্ভব। সমিতি ধাত্রীদিগকে শিক্ষা দিতে এবং যা'তে শিশুদিগের অকালমৃত্যু না হয়, তা'র চেষ্টা ক'র্‌তে পারেন এবং আশাকরি ক'র্‌বেন। তা'হ'লে সমিতি স্থাপনের আরও বিশেষ সার্থকতা হ'বে। সম্প্রতি আমার প্রস্তাবে বাঁকুড়ায় ধাত্রীদিগের শিক্ষা দিবার জন্য, ও গরীবদের ছেলেদের বিনাব্যয়ে চিকিৎসার বন্দোবস্ত কর্‌বার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হ'য়েছে। এই কমিটিতে এখানকার সিভিল সার্জ্জন ও স্থানীয় অনেক সুযোগ্য ডাক্তার এবং ভদ্রলোক এবং মিসেস্ ব্রাউন্ সভ্যরূপে আছেন। তাঁ'রা ইতিমধ্যে যা'তে বাঁকুড়া সহরের ধাত্রীরা উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে তা'দের কাজ ভালরূপে সম্পন্ন ক'র্‌তে পারে, তা'র বন্দোবস্ত ক'র্‌তে আরম্ভ ক'রেছেন এবং শিক্ষিতা ধাত্রীদের মেডেল দিবার ব্যবস্থা ক'রেছেন।

অনেকে জানেন যে, শিক্ষিতা ধাত্রীদিগের অভাবে আমাদের দেশে কত প্রসূতি ও শিশু অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমি আশা করি, আপনারা সকলে এই মহৎ কাজের উপর আপনাদের দৃষ্টি রাখ্‌বেন ও তা'তে সাহায্য ক'র্‌বেন। আপনারা শুনে সুখী হ'বেন যে, ধাত্রীদের শিক্ষায় যে খরচ হ'বে, তা'র ব্যয়ভার বহনকল্পে সমিতি ১০০৲ টাকা দান ক'র্‌তে প্রতিশ্রুত হ'য়েছে।

পরিশেষে এই প্রার্থনা করি যে, যাঁ'র কৃপায় আমরা এই সমিতি-মহীরুহটী রোপন ক'রেছি, তাঁর আশীর্ব্বাদে এটী ফুলে-ফলে ভ'রে উঠে বাঁকুড়ার মঙ্গল সাধন ক'র্‌তে সাহায্য করুক।

বীরভূমের অন্নক্লিষ্ট নরনারীর দুঃখ লাঘবের জন্য

সরোজনলিনীর আবেদন

——:০:——

কালেক্টর কুঠি,
সিউড়ী।
১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৯।

প্রীতিবরাষু—

বর্ত্তমান বর্ষের দেশব্যাপী অন্নকষ্ট হইতে বীরভূমও রক্ষা পায় নাই। গত বৎসর আশ্বিন মাসে বৃষ্টি না হওয়ায় ধান্য কম জন্মিয়াছে। এ বৎসর সুবৃষ্টি হওয়াতে আশা হইতেছিল, চাউল ক্রমেই সস্তা হইবে, কিন্তু নানা কারণে দেখিতেছি, বীরভূমেও চাউল ক্রমেই মহার্ঘ হইতেছে। সিউড়ী বাজারে মোটা চাউল পাকি /৪ সের দরে বিক্রয় হইতেছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে দু'বেলা আহারের সংস্থান দুষ্কর হইয়াছে। সাধারণ দরিদ্র লোকের দুর্দ্দশার কথা তো বলিতেই নাই, তাহাদের একবেলা আহার জুটিয়া উঠা ভার হইয়াছে। এখনও দুই মাস কাল চাউল সস্তা হইবার কোন আশা দেখা যাইতেছে না। নারীজাতি—মাতৃজাতি. অন্নক্লিষ্টের হাহাকার মাতৃজাতির প্রাণেই বিশেষ-ভাবে আঘাত করে। বীরভূম মহিলা-সমিতি এই দুর্দ্দিনে বীরভূমের বুভুক্ষিত নরনারীর সাহায্যার্থে যৎকিঞ্চিৎ আয়োজন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ হইলে তদ্দ্বারা চাউল ক্রয় করিয়া বাজার হইতে সস্তা দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে দরিদ্র লোক বিশেষভাবে উপকৃত হইবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থে বারংবার ঐরূপ সাহায্যের বন্দোবস্ত হইতে পারিবে। অন্নক্লিষ্ট নরনারীর ক্লেশ লাঘবের জন্য দান—শ্রেষ্ঠ দান ; বুভুক্ষিত নরনারীর সেবাই ভগবানের সেবা। আমি বীরভূম মহিলা-সমিতির পক্ষ হইতে আপনাকে এই পুণ্যকার্য্যে যথোপযুক্ত দান করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, ক্ষুধার্ত্ত, জীর্ণশীর্ণ নরনারীর মুখের দিকে তাকাইয়া সমিতির এই শুভ-সঙ্কল্প সাধনে আপনি সহায় হইবেন। যদি উপযুক্ত অর্থসংগ্রহ হয়, তাহা হইলে কিছু কাপড়ও দরিদ্র স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে বিতরণ করা হইবে। আপনি যে অর্থ প্রদান করেন, তাহা আমার নামে উপরিলিখিত ঠিকানায় অনুগ্রহপূর্ব্বক অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন। যিনি যাহা দান করেন, তাহা স্থানীয় সংবাদপত্রে স্বীকৃত হইবে। ইতি

প্রীতিবদ্ধা

বীরভূমের জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

"শ্রীমতী দত্ত যে পর্য্যন্ত এ জেলায় শুভাগমন করিয়াছেন, সেই শুভ মুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহার করুণ হৃদয় বাধা না মানিয়া তাঁহাকে জননীর মত সন্তানের জন্য সতত ব্যাকুলিত করিয়া তুলিয়াছে। গত কৃষিশিল্প প্রদর্শনা উপলক্ষে যে Fancy fair (সখের বাজার) হইয়াছিল, সে সময়ে ৫ দিন একাদিক্রমে আপনার আরাম বিরামে জলাঞ্জলি দিয়া যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য প্রত্যাশায় একমনে ভিখারিণীর মত তাহাকে সেখানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। আমাদের সাধারণ গৃহস্থ ঘরের রমণীদিগকে শিক্ষা অভাবে হৃদয় থাকিতেও বাহিরের আহ্বানে বড় জাগরিত হইতে দেখা যায় না, কিন্তু এই দেবীপ্রতিমার আগমনে, তাঁহার স্নেহপূর্ণ আহ্বানে আমাদের অন্তঃপুরবাসিনীরাও আজ জাগরিতা। যদিও এত বড় একটা ভীষণ যুদ্ধে দিগন্ত পরিপ্লাবিত হইয়াছে, যদিও ইহার জন্য জগতের সমস্ত ভাগেই একটা উদ্বিগ্নতার ছায়া পড়িয়া আঁধার করিয়া রহিয়াছে, যদিও আবালবৃদ্ধ প্রায় সকলেই কিছু না কিছু চিন্তিত, কিন্তু আমাদের অন্তঃপুরচারিণীরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত এবং নিশ্চিন্ত। ইহার কারণ— শিক্ষার অভাব, জাগাইবার লোকের অভাব। আমাদের সে অভাব আজ পরিপূর্ণ। শ্রীমতী দত্তের আগমনে আমরা, বিশেষ আমাদের রমণীরা আজ ধন্য।

* * * *

"ধনী-দরিদ্র বিচার না করিয়া, আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতা উৎসর্গ করিয়া, প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে যাইয়া স্নেহ ও শ্রদ্ধা সহকারে পুরনারীদিগকে তিনি যেরূপ উৎসাহিত করিতেছেন, ইহা কেবল হিন্দুনারীতেই সম্ভব।"

[১৩২৩ সালের ৩রা ভাদ্র তারিখের 'বীরভূম বার্ত্তা' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত]

বীরভূম মহিলা-সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে গীত দুইটি গান

১

অভিভাষণ-গীতি

[১]

তব গৌরব করি অনুভব
সবাই আমরা হৃদয় মাঝ,
তব সম্মানে আমাদের প্রাণে
নব উৎসব লাগিল আজ।
সর্ব্ব আদরে আপনার করে
ডাকিয়াছ সবে তোমার আলয়ে,
আমরা সবাই মিলিয়াছি তাই
পুলকিত চিতে ফুল্ল হৃদয়ে।
আমরা তোমার, তুমি আমাদের শ্রেষ্ঠ অগ্রগণ্য,
ধন্য তুমি, তোমার সনে মোরাও হইনু ধন্য!

[২]

নারীর সম্মান করিতে বর্দ্ধন
করিয়াছ তুমি জীবন-ব্রত,
(এ) কঠোর সাধনা সাধিতে তুমি
হাসি মুখে দুঃখ সহিছ কত।
যশ অপযশে না হ'যে অবশ
নারীর উন্নতি করিতে সাধন,
নিজ দুঃখ সব নীরবে সহিয়া
সাধিছ কর্ত্তব্য পরাণ-পণ।
আমরা তোমার, তুমি আমাদের শ্রেষ্ঠ অগ্রগণ্য,
ধন্য তুমি, তোমারে পাইয়া মোরাও হইনু ধন্য!

[৩]

হৃদয়ের আলো নিবেনি তোমার,
দেবতার ধ্রুব আলোক এ যে,
আশা-নিরাশায় বিমল প্রভায়
জ্বলিছে সে আলো সমান তেজে।
গুণের আদর করিছ গো তুমি
গুণী জনে দিয়া এ মহা মান,
কৃতজ্ঞতা ভরা হৃদয়ে আমরা
করি আজি তব মহিমা গান।
আদর্শ-রমণী "সরোজনলিনী' তুমিই অগ্রগণ্য,
ধন্য তুমি, তোমারে পেয়ে মোরাও হইনু ধন্য!

২

সমিতি-গাথা

[১]

মহিলা-সমিতি কথা
স্বপ্ন-সম ছিল হেথা,
আনন্দ-মূরতিখানি 'দত্ত-গৃহিণীর'
নব সাধ নব আশে
আকিঞ্চন সুবাতাসে
প্রথম ভাঙ্গিল ঘুম সমিতি-নদীর।

[২]

চেতন লভিল যদি
ঘুমন্ত সমিতি-নদী
"দত্ত-গৃহিণীর" চারু পবিত্র পরশে,
স্নিগ্ধ করি চারি ধার
স্ফীত করি বক্ষ তার
প্রকাশিতে চাহে সে যে তাঁহারি হরষে।

[৩]

জাগন্ত নদীর কূলে
আপনি আপনা ভুলে
"দত্ত-লক্ষ্মী" লয়ে ফুলদল বঙ্গবালা,
মিলন উদ্দেশ্য লয়ে
'পরের' 'আপন' হয়ে
প্রীতি ও সদ্ভাবসূত্রে গাঁথিলেন মালা।

[৪]

ধীরে ধীরে জ্ঞান-কর্ম্ম
জাগিতেছে দয়া-ধর্ম্ম
মালার সুরভি শ্বাসে নবীন শোভায়;
জুড়াইবে তপ্ত হিয়া
এ মালার ঘ্রাণ নিয়া
নিবিড় আনন্দ ঘন পুণ্যের প্রভায়।

[৫]

মালা যেন শুকায় না,
গন্ধ যেন ফুরায় না,
ঘুমায় না যেন আর সমিতি-তটিনী;
চেষ্টা যত্ন শক্তি দিয়ে
রাখি তারে জীয়াইয়ে,
বাসনা আমার আজি যতেক ভগিনী।

[৬]

এ বিশ্ব-মন্দিরে আজ
বিশ্বনাথ! মহারাজ!
সুরম্য করিয়া দাও এ নারী-সমিতি;
তুমিই করিতে পার,
তুমিই সার্থক কর
তোমার পূজার মালা, এ মোর মিনতি।

[৭]

প্রতি চিত্ত ভ'রে ভ'রে

থাকে যেন ঘরে ঘরে

প্রীতি ও সদ্ভাব আর পর-উপকার,

শুধু কথা নহে প্রভু ! আকাঙ্ক্ষা আমার।

নগেন্দ্রবালা রায়,

সম্পাদিকা, বীরভূম মহিলা-সমিতি।

শোক-প্রকাশক পত্র

সরোজনলিনীর পরলোকগমনের পর তাঁহার শত শত বন্ধু-বান্ধব যে-সকল শোক-প্রকাশক পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সাধারণের অবগতির উপযোগী কয়েকখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

—— :০: ——

সরোজনলিনীর পরলোকগমনের অব্যবহিত পরে কলিকাতায় নারী-কর্ম্মী-সঙ্ঘের যে বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহাতে বঙ্গের মাননীয় গভর্ণর লর্ড লিটন ও তাঁহার পত্নী উভয়েই প্রকাশ্যভাবে সরোজনলিনীর সমাজ-সেবা কার্য্যের যারপরনাই প্রশংসা করিয়াছেন।

মাননীয় লর্ড লিটন গ্রন্থকারকে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহার সারাংশের বাংলা অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল :—

"লাট প্রাসাদ, কলিকাতা।

"২০শে জানুয়ারী, ১৯২৫।

"প্রিয় মিঃ দত্ত,

"আপনার স্ত্রী-বিয়োগের সংবাদ পাইয়া আমি বিশেষ দুঃখিত। আপনার শোকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি। আপনার সহধর্ম্মিণী সমাজের মঙ্গলজনক অনুষ্ঠানগুলির উন্নতিকল্পে যেরূপ অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেন এবং সমাজ-হিতকর কার্য্যে যেরূপ সুন্দর আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই লোকে একটি পরম বন্ধুবিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিবে।

* * * * *

"আপনার অকপট

"(স্বাঃ) লিটন।"

কলিকাতা নারী-কর্ম্মী-সঙ্ঘের (Calcutta League of Women Workers) সম্পাদিকা শ্রীমতী রাসফোর্থ লিখিয়াছেন :—

"প্রিয় মিঃ দত্ত,

'আপনার স্ত্রী-বিয়োগে সবিশেষ দুঃখ ও সহানুভূতি জানাইয়া পত্র লিখিবার জন্য লীগের কার্যকরী সমিতি আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। লীগের কার্য্যে মিসেস্ দত্ত যেরূপ অকপটতা ও উৎসাহের সহিত আত্মনিয়োগ করিতেন, তাহাতে মনে হয়, আমরা তাহার কার্য্যের পর্য্যাপ্ত প্রশংসা করিয়া উঠিতে পারিব না। আর আজ তাঁহার বিয়োগে আমরা যে কত দুঃখিত, তাহা এ ক্ষুদ্র পত্রে প্রকাশ করিতেও পারিব না।

"আপনার অকপট

"উনিফ্রেড রাসফোর্থ,

'কলিকাতা নারী-কর্ম্মী-সঙ্ঘের অবৈতনিক সেক্রেটারী।'

ভূতপূর্ব্ব কমিশনার ও রাজস্ব-বোর্ডের মেম্বর শ্রদ্ধেয় সিভিলিয়ান মিঃ ডি, এইচ, লীজ (Mr. D. H. Lees) I. C. S. লিখিয়াছেন :—

"মিসেস্ দত্তের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া আমি বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। * * * মিসেস্ দত্তকে উচ্চতম আদর্শের ভারতীয় মহিলা জ্ঞানে বরাবর তাঁহার প্রতি আমার সবিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা ছিল।

"বাংলার মহিলাকুলের শিক্ষাবিষয়ক ও সামাজিক উন্নতিকল্পে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সমাজের সকলের প্রতি সহানুভূতি ও কর্ম্ম-কুশলতার গুণে এই বিরাট আন্দোলনে নেতৃত্ব করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগিনী ছিলেন। তাঁহার বিয়োগে বাংলার বিশেষ ক্ষতি হইল।'

National Indian Association (ভারতীয় জাতীয় নারীসঙ্ঘ) এর সম্পাদিকা শ্রীমতী শ্রোজ্ব্রি (Mrs. Shrosbree) লিখিয়াছেন :—

'"ভারতীয় জাতীয় নারীসঙ্ঘের কলিকাতা-মহিলা-অনুষ্ঠান-শাখার কার্য্যকরী সভার মেম্বরগণের অভিপ্রায় অনুসারে মিসেস্ দত্তের পরলোকগমনে আপনার সঙ্গে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি। তিনি যে নানাবিধ সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার কথা ভাবিয়া আপনি প্রাণে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিবেন, আশাকরি।"

চব্বিশ পরগণার ভূতপূর্ব্ব কলেক্টরের পত্নী শ্রীমতী লিগুসে লণ্ডন হইতে লিখিয়াছেন :—

"সমাজের সকল সম্প্রদায়ের লোকই মিসেস্ দত্তের অভাব অনুভব করিবে। তিনি সকল সম্প্রদায়ের এবং সকল সদনুষ্ঠানের জন্য প্রকৃত মঙ্গল চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।'

বিখ্যাত সুলেখক বিলাত প্রবাসী শ্রীযুক্ত সন্ত নিহাল সিং (Mr. St. Nihal Singh) লিখিয়াছেন :—

"আমি ও আমার স্ত্রী, মিসেস্ দত্তের আতিথ্যগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। তাহা হইতেই আমরা তাঁহার চরিত্রের সৌন্দর্য্যে একান্ত মুগ্ধ হইয়াছিলাম এবং আপনার জীবনে তাঁহার যে কতদূর মঙ্গলময় প্রভাব ছিল ও আপনাদের উভয়ের মধ্যে যে কি ঘনিষ্ঠ দাম্পত্য-বন্ধন ছিল, তাহা জানিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছিল।

লণ্ডন হইতে এংলো-ইণ্ডিয়ান টেম্পারেন্স সমিতির (Anglo-Indian Temperance Association) সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফ্রেডরিক গ্রাব (Mr Fredrick Grubb) মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"আপনার স্ত্রী স্বীয় চরিত্র মাধুর্য্যে আমার ও আমার স্ত্রীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন. তাঁহার চরিত্রের মহানুভবতা ও সৌন্দর্য্যের পরিচয় আমরা অনেক বিষয়ে পাইয়াছিলাম।

আমেরিকা হইতে রেভারেণ্ড জে, পি, নীক্ মহাশয় নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছেন :—

"১২০ সাউথ হামফ্রি এভিনিউ
ওক পার্ক
ইলিয়ানিস্ (Illionis)
ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্।
৫ই মার্চ্চ, ১৯২৫।

"আমি ও আমার স্ত্রী. মিসেস্ দত্তকে অসীম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতাম এবং আমরা উভয়েই তাঁহাকে বোনের মত ভালবাসিতে শিখিয়াছিলাম। তিনি বস্তুতই একটি আদর্শ-রমণী ভারতবর্ষের মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন তাঁহার পরলোক-গমনে

কেবল যে আপনার ক্ষতি হইয়াছে তাহা' নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের ক্ষতি,—কেননা, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলকল্পে অশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন।"

বামাবোধিনী মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবী লিখিয়াছেন :—

"আজ মহীয়সী নারীর আদর্শস্থানীয়া সহোদরোপমা সরোজনলিনী দেবীকে অকালে হারাইয়া আমরা যে কি প্রকার বেদনা অনুভব করিতেছি, তাহা সামান্য পত্রের ভাষায় জানাইতে অক্ষম।"

শ্রীমতী হৃদাবালা বসু এম, এ লিখিয়াছেন :—

"এ ক্ষতি শুধু আপনার নয়, তাঁহার এত অল্পবয়সে অকস্মাৎ পরলোকগমনে সমস্ত দেশ আজ যারপরনাই ব্যথিত ও ক্ষতিগ্রস্ত। তিনি তাঁর তরুণ জীবনকে দেশের নারীদের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য ও সরলতা দ্বারা অসংখ্য লোকের শ্রদ্ধা ও সখ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন।"

শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর গিরীশচন্দ্র নাগ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"তাঁহার নানাবিধ সৎকার্য্যে তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতাম। ভারতের নারীজাতির সেবায় তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, সাধারণের সেবায় উৎসর্গিত এমন সুন্দর জীবনটি এত অকালে শেষ হইয়া গেল। সমগ্র দেশ আজ তাঁহার অভাবে ব্যথিত।"

শ্রীযুক্ত জাষ্টিস স্যার নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"তাঁহার মধুর চরিত্র এবং স্ত্রীজাতি ও শিশুদের মঙ্গলের জন্য তাঁহার অশ্রান্ত কার্য্যের কথা ভাবিয়া আজ সকলেই তাঁহার অকাল-পরলোকগমনে মর্ম্মাহত।"

শ্রীহট্টের "কমলা" নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক, অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রায় বংশীমোহন দাস বাহাদুর লিখিয়াছেন :—

"এই কন্যারত্ন হারাইয়া আজ বঙ্গমাতা সত্য-সত্যই দীনা মলিনা হইলেন। ফুল ভাল করিয়া ফুটিতে না ফুটিতে ঝরিয়া পড়িল। দেশ-মাতৃকার এমন সুসন্তান আর কয়টি আছে?

জননীর দুর্গতি মোচনের জন্য এমন ব্যাকুলতা লইয়া সতীসাধ্বী কার্য্যগুলির ভার কাহার হাতে দিয়ে গেলেন?

"আমি কত আশাই করেছিলাম—তাঁহাকে দেশের কত কাজে নিযুক্ত করিব। আমার সকল আশাই আজ নিরাশ হইল।"

বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতন বিভাগের বিখ্যাত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ লিখিয়াছেন :—

"আপনার সঙ্গে সেইদিন আপনার বাড়ীতে বসিয়া এ দেশের নারী-জাতির উন্নতি সম্বন্ধে কত আলোচনা করিয়া যে আশায় বুক বাঁধিয়া আসিয়াছিলাম—ভগবান হঠাৎ আমাদের সকল আশা ভরসার মূলে কুঠারাঘাত করাতে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি।

"সমগ্র বঙ্গদেশের নারীজাতির অকৃত্রিম সুহৃদ্ মিসেস্ দত্তের মৃত্যুতে সমগ্র দেশ আজ ব্যথিত। আমরা দূরে থেকেও গভীররূপে সেই বেদনা অনুভব করিতেছি। একদিন মাত্র তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ, তার মধ্যেই আমাদের দেশের নারীজাতির সেবার জন্য যে আন্তরিক ব্যাকুলতা দেখিয়াছি, আমি আর কাহারও মধ্যে তাহা দেখি নাই!"

শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"তাঁহাকে জানিবার সৌভাগ্য আমাদের যাহাদের হইয়াছিল, সকলেই জানি, আপনার সমস্ত কল্যাণকর্ম্মে তিনি আপনার কত বড় সহায় ছিলেন; সিউড়ীর মত স্থানেও তিনি আপন চরিত্রের মাধুর্য্যে এবং শক্তিতে কেমন করিয়া মেয়েদের মধ্যে প্রাণ-সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন, জনহিতে তাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।"

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"আপনার স্ত্রী অতি সাধ্বী ও মহীয়সী রমণী ছিলেন। সরোজনলিনীকে আমি সর্ব্বদাই কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় মনে করিতাম। তাঁহার চরিত্র স্বর্গের দেবীর ন্যায় মধুরিমা-ময় ছিল।"

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন :—

"এই আকস্মিক দুর্ঘটনার বজ্রপাতের খবরে যে কি মর্ম্মাহত হ'য়েছি, তা' বলবার নয়। তিনি যথার্থই তোমার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। গৃহে, কর্ম্ম ক্ষেত্রে— সব জায়গায় তোমার

সহায়তা ক'রতেন। কয়দিনের পরিচয়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের যে আত্মীয়তার বন্ধন ঘটেছিল, তা' সম্ভবপর হ'য়েছিল তাঁ'র অকৃত্রিম সহৃদয়তার গুণে।"

পাবনা হইতে শ্রীযুক্ত রায় সাহেব তারকনাথ মৈত্র মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

"আপনার স্ত্রীকে আমি সাক্ষাৎভাবে জানিতাম। তাঁহার ন্যায় গুণবতী মহিলা বাংলাদেশে—বাংলায় কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে বিরল। আমি উপলব্ধি করিতেছি যে, আপনার নিজ জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও সাফল্য কত অধিক পরিমাণে আপনার গুণবতী ভার্য্যার সদগুণে অধিকতর সাফল্য-লাভ করিয়াছিল। * * * আজ মনে হইতেছে, আপনার নিকট দেশ যাহা পাইতেছিল—তাহা আর বুঝি সেরূপ পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরভাবে পাইবে না। এ ক্ষতি কেবল আপনার নয়,—সমগ্রদেশের। রাজকীয় কর্ম্মসংশ্রবে, যেখানেই আপনি গিয়াছেন, সেখানেই আপনার সহধর্ম্মিণীও স্থানীয় সামাজিক জীবনের উচ্চতর আদর্শের ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। দেশের নারী-সমাজের উন্নতির বহুল অন্তরায়, সুতরাং এইরূপ বিদূষী ও কর্ম্মিণী মহিলার প্রভাবের মূল্য সমাজে অতুলনীয়। এই পাবনা সহরে থাকাকালীন এখানকার নারী-সমাজে তিনি যেরূপ ভাবে তাঁহার উচ্চ আদর্শ নীরবভাবে রাখিয়া গিয়াছেন, পরোক্ষভাবে আজও তাহার সুফল ভোগ করিতেছি।

"আমার স্ত্রী ও কন্যাগণ, তাঁহার সহিত সুপরিচিতা ছিলেন—আজ তাঁহারাও এই বিদূষী মহিলার জন্য আমার ন্যায় দুঃখ-প্রকাশ করিতেছেন। আমার তৎকালীন একটি ছোট কন্যাকে তিনি যে পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন—তাহাও আজ তাহাদিগকে তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলাইতেছে।"

মাননীয়া লেডী বোস লিখিয়াছেন ঃ—

"বাণীভবনের বিশেষ করিয়া যে ক্ষতি হইল, তাহা পূর্ণ করিবে এমন লোক ত দেখি না। তিনি বেঁচে থাকিলে দেশে মেয়েদের মধ্যে একটা জাগরণ আনিতেন নিশ্চয়। ভগবানের কি ইচ্ছা বুঝি না।"

গত ৫ই ফ্রেব্রুয়ারী কলিকাতায় নারী-শিক্ষা-সমিতির কাউন্সিলের অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে ঃ—

"শ্রীমতী সরোজনলিনী দত্ত অকালে লোকান্তরিত হওয়ায় নারীশিক্ষা সমিতির কাউন্সিল্ বিশেষ দুঃখপ্রকাশ করিতেছেন। তিনি নারী জাতির শিক্ষা ও সর্ব্ববিধ উন্নতিকর কার্য্যের

সাহায্যার্থ অশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করিতেন। মহিলাদের আর্থিক উন্নতি উদ্দেশ্যে তিনি নিজে যেমন কঠোর পরিশ্রমেও পশ্চাৎপদ হইতেন না, তেমনই অপরকেও আবার আত্ম-নিয়োগ করাইতেন। বিদ্যাসাগর-বাণীভবনের সহিত তাঁহার সংশ্রব অতি অল্পদিনের হইলেও তাঁহার অকপটতা ও আগ্রহ সকলকেই বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছিল।"

বাঁকুড়া মহিলা-সমিতি তাঁহাদের বর্ত্তমান সভানেত্রী বাঁকুড়া কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পত্নী শ্রীমতী ব্রাউনের নেতৃত্বে এক শোক-সভা আহ্বান করিয়া যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার নিম্নলিখিত মর্ম্ম শ্রীমতী ব্রাউন্ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন :—

"বাঁকুড়া মহিলা-সমিতি

"সরোজনলিনী-স্মৃতি-সভা

—:০:—

"গত ৩০শে জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যাকালে বাঁকুড়ার কলেজ-হলে স্থানীয় মহিলা-সমিতির সাধারণ সভার এক বিশেষ অধিবেশন হয়। সভার উদ্দেশ্য—শ্রীমতী সরোজ-নলিনী দত্তের অকাল-মৃত্যুতে সমিতির পক্ষ হইতে গভীর শোকপ্রকাশ এবং স্বর্গগতা মহিলার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা। মিঃ জি, এস, দত্ত যে সময় বাঁকুড়া জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই সময় ১৯২২ অব্দে মিসেস্ দত্ত এই মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। মিঃ দত্ত কলিকাতায় বদলী হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ১৯২৩ অব্দের অক্টোবর মাস অবধি তিনি সমিতির কর্ত্রী (প্রেসিডেণ্ট) ছিলেন। সরোজনলিনী চলিয়া যাইবার পূর্ব্বেই সমিতিতে ৯০ জন সদস্য হয়েন এবং হাসপাতাল গুলিতে নিয়মিতভাবে সাহায্য করা ধাত্রীদিগকে শিক্ষিত করিয়া তোলা প্রভৃতি অনেক জন-হিতকর কার্য্যেই সমিতি হস্তক্ষেপ করেন। সমিতির সদস্যারা তখন স্বাস্থ্য-তত্ত্ব, শিশুপালন প্রভৃতি অনেক বিষয়ে বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং উচ্চাঙ্গের সূচি-শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য একটি শ্রেণী তখন খোলা হইয়াছিল। সরোজনলিনী কলিকাতা চলিয়া যাইলেও সমিতির মঙ্গল-চিন্তা পরিত্যাগ করেন নাই।

"সম্প্রতি তিনি সমিতিকে যে ভাবে কাজ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই কাজ করিয়াই বাঁকুড়ায় তাঁহার যোগ্য স্মৃতিচিহ্ন রাখা যাইতে পারে। বাঁকুড়ার মেডিক্যাল-স্কুলের হাসপাতালে যাহাতে দরিদ্র স্ত্রীলোকেরাও চিকিৎসিত হইতে পারে, তিনি সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দেন।

"মহিলা সমিতির উন্নতি-কল্পে সরোজনলিনী যে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা ও তাঁহার বিয়োগে দুঃখপ্রকাশ করিয়া সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়। আর বাঁকুড়ার মেডিক্যাল-স্কুল-হাসপাতালের সহিত যাহাতে একটি মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সেজন্য অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই মন্দিরের নাম হইবে 'সরোজনলিনী দত্ত স্মৃতি-গৃহ'। গৃহটির বাহিরের দেওয়ালে প্রস্তর-ফলকে তাঁহার স্মৃতির কথা লেখা থাকিবে, ভিতরে তাঁহার একখানি বড় চিত্র স্থাপিত হইবে—যাহাতে অন্যান্য মহিলারা তাঁহার এই স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা দেখিয়া দেশের নারী-সাধারণের সেবায় তাঁহার অনুরক্তির আদর্শ গ্রহণ করিতে উৎসাহিত হইতে পারেন।"

শ্রীমতী ব্রাউন্ সরোজনলিনীর জীবন ও কর্ম্মের আদর্শে মুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছেন:—

"আমি আপনাকে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, যতদিন আমি বাঁকুড়ায় থাকিব ততদিন মিসেস্ দত্তের অভিপ্রায় ও আদর্শ অনুরূপ কাজ করিবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিব, এবং আমার বিশ্বাস যে বাঁকুড়া মহিলা-সমিতির কার্য্যকরী সভার প্রত্যেক সভ্যের মনেও এই প্রতিজ্ঞা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে।"

পাবনার "নারী-শিল্পাশ্রমের" বর্ত্তমান সম্পাদিকা সিতলাইর জমিদারের শ্রদ্ধেয়া পত্নী শ্রীমতী সরলা মৈত্র লিখিয়াছেন:—

"তাঁহার ন্যায় গুণবতী সহৃদয়া রমণী বঙ্গদেশে দুর্লভ। আজ তাঁহার অভাবে বঙ্গজননী একজন শ্রেষ্ঠ নীরব কর্ম্মী হারাইয়া ম্রিয়মাণা হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। তিনিই প্রথম পাবনাতে নারীগণের হৃদয়ে জাগরণের মহামন্ত্র প্রচার করিয়া যান।"

আর একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন:—

"তিনিই সর্ব্বপ্রথম পাবনাতে মহিলা-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সমিতিই এক্ষণে "শিল্পাশ্রম" নাম গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মী ও উচ্চমনা নারী বঙ্গদেশে দুর্লভ।"

বাঁকুড়া-কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রদ্ধেয় রেভারেণ্ড্ ব্রাউন্ লিখিয়াছেন:—

"আপনার পত্নীর মত পরোপকারী মহিলাকে হারাইয়া বাঙ্গালা আজ সত্যই দরিদ্র হইয়াছে। তিনি তাঁহার দেশের ভগ্নীগণের উন্নতির জন্য অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন এবং বাঁচিয়া থাকিলে আরও অনেক করিতেন। আশা করি তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সকলে তাঁহার মত উৎসাহ ও স্বার্থত্যাগের দ্বারা পরোপকার-ব্রতে আত্মনিয়োগ করিবেন।"

কলিকাতার একজন বিশিষ্ট খৃষ্টান বন্ধু লিখিয়াছেন :—

"মানুষের যাবতীয় পাপ এবং দুঃখকষ্ট সম্পর্কীয় বিষয়ে ভগবানের করুণার আভাস তাঁহার ভিতর হইতে সর্ব্বদা ফুটিয়া উঠিত বলিয়া আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিলাম।'

একটি মহানুভবা ইংরাজ মিশনারী-রমণী লিখিয়াছেন :—

'মিসেস দত্তের সঙ্গে পরিচিত হইয়া আমি জীবনে তাঁহার কাছ থেকে অনেক মূল্যবান জিনিস শিখিয়াছি। আমি যতই একথা ভাবি ততই আত্মসম্বরণ করিতে অসমর্থ হই।

শ্রীহট্ট সমাজ সেবক সঙ্ঘ নিম্নলিখিত শোক প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়া পাঠাইয়াছেন :—

'শ্রীহট্ট জিলার গৌরব স্থানীয়া পতিতব্রতে অক্লান্ত কর্ম্মী, সমাজ সেবা, স্ত্রী শিক্ষা, এবং নারী জাতির উন্নতি বিধানে সদাতৎপর ব্রাহ্মিকা মহিলা সরোজনলিনী দত্ত মহোদয়ার আকস্মিক পরলোক গমনে শ্রীহট্ট সমাজ সেবক সঙ্ঘ আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন।

পাটনা হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত জাষ্টিস বসন্তকুমার মল্লিক লিখিয়াছেন :—

'তিনি একটি মহীয়সী ও অসামান্য গুণবতী রমণী ছিলেন, তাঁহার স্থান পূরণ করা কঠিন হইবে।

জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরাজ বন্ধু লিখিয়াছেন :—

বাঙ্গালা দেশে আমার সুদীর্ঘ ২১ বৎসরব্যাপী ভ্রমণ পথে পথের দূরত্ব নির্দ্দেশক স্তম্ভের ন্যায় বহু লোকেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু তন্মধ্যে তিনটি স্তম্ভই নিজ নিজ গগনস্পর্শী উচ্চতায় আর সকলকে খর্ব্ব করিয়া চিরকালের জন্য আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া আছেন—সে ছবি কখনও মুছিবার নয়। আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্পর্কেই এই তিনটি মহৎ জীবনের সহিত পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল—যাঁহারা স্বার্থ বা আত্মোন্নতির চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া শুধু পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহারা শুধু শুভকামনা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন না—কর্ম্মবহুল জীবনের অবসরমাত্রেই পরের মঙ্গল চিন্তা করিতেন। ঐ সময়ে আমি আরও সহস্র সহস্র লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম, যাঁহাদের সকলের কথাই ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু সেই তিন জনকে বহু দিনের পূর্ব্বের মত সমভাবেই মনে আছে। আপনার পত্নী ইঁহাদের মধ্যে একজন। ইঁহাদের বিষয়ে আমার পুরাতন গ্রীক প্রবাদ বাক্যের কথা স্মরণ হইতেছে যে 'ভগবান যাঁহাদের ভাল বাসেন, তাঁহাদের অল্প বয়সে পরলোক গমন করিতে হয়।'

'জীবন পথের অনেক ক্লান্ত পথিকই তাঁহার সহাস্য উৎসাহবাণীর অভাবটি বিশেষ করিয়া অনুভব করিবেন।'

বঙ্গীয় কৃষিবার্ত্তা-সম্মিলনীর সম্পাদক লিখিয়াছেন :-

"তাঁহার জীবনের সৎকার্য্য গুলির মহৎ আদর্শ বহুদিন পূর্ব্বেই নিজ পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছিল এবং এক্ষণে উহা সমগ্র দেশবাসীদের সম্পদ রূপে পরিণত হইয়াছে এবং সকলেই উহার ফলের অধিকারী হইয়াছেন।'

বাঁকুড়া-সম্মিলনীর কার্য্যকরী সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে :—

"এই সভা শ্রীমতী সরোজনলিনী দত্তের অকাল পরলোক গমনে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। নানাবিধ জন হিতকর কার্য্য এবং দেশের, বিশেষ করিয়া বাঁকুড়া জেলার নারী জাতির উন্নতিকল্পে দেশমাতৃকার নিঃস্বার্থ সেবায়, তিনি এই জেলার অধিবাসী বৃন্দের স্নেহ ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।'

মান্দ্রাজের আদিয়ার (Advar) আশ্রম হইতে বিখ্যাত পণ্ডিত মঃ কাজিনস (Cousins) এর পত্নী শ্রীমতী গ্রেটা কাজিনস লিখিয়াছেন :—

"আজ জানিতে পারিলাম যে আপনার সৌন্দর্য্যময়ী ও প্রতিভাময়ী পত্নী অকালে চলিয়া গিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত আপনাদের আবার মিলন না হয় ততদিন তাঁহার অভাব আপনার জীবন ভারাক্রান্ত করিবে। এ ক্ষতি আর পূরণ হইবার নয়। বাস্তবিকই আপনি এবং নারী জাতির উন্নতির কার্য্যে ব্রতী আমরা সকলে তাঁহার সাহায্যের উজ্জ্বল প্রেরণা হইতে বঞ্চিত হওয়ায় আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি। আজ মনে হইতেছে, যারা ভাল তারাই চলিয়া যায়। তবে আমি বিশ্বাস করি যে পরলোকেও অন্তরালে থাকিয়া তাঁহারা তাঁহাদের শক্তি সামর্থ্য দিয়া আমাদের সাহায্য করিতে পারেন।

লণ্ডন হইতে শ্রীযুক্ত ওয়াল্টার ফ্রান্সিস ওয়েষ্টব্রুক মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"কিছুদিন আগে আপনারা যখন ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন তখন আপনার ও আপনার পত্নীর সঙ্গে আলাপের বড় প্রীতিময় স্মৃতি আমাদের মনে জাগিয়া আছে। তাঁর চরিত্রের মাধুর্য্য-গুণে আমরা এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে তারই জোরে আমরা আপনাদের বন্ধুত্বের দাবী করিতাম। আমরা মনে করি যে এ ক্ষতি আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—একখানি কোমল ও পবিত্র প্রাণ হারাইয়া ভারতবর্ষ বাস্তবিকই আজ ক্ষতিগ্রস্ত।"

সরোজনলিনীর শ্রাদ্ধ-উপলক্ষে তাঁহার স্বামী-কর্ত্তৃক তৎপ্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশার্থ এবং তাঁহার আত্মার তৃপ্তিসাধনের জন্য দানের তালিকা ঃ—

—:০:—

১। সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজ ... ... ১০০৲

২। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ .. .. ১০০৲

৩। কলিকাতার শিশুমঙ্গল কেন্দ্রীয় সমিতি (Baby Week Committee) ১০০৲

৪। কলিকাতা মহিলা-কর্ম্মী-সঙ্ঘের (Calcutta League of Women Workers) ভারতীয় মহিলা-বিভাগ ... ১০০৲

৫। বিদ্যাসাগর বাণীভবনের মহিলাদের শিল্প শিখিবার জন্য ... ১০০৲

৬। শ্রীহট্ট-সম্মিলনী (মহিলাদের মধ্যে শিল্প-শিক্ষা বিস্তারের জন্য) ... ১০০

৭। বাঙ্গালী সহায়িকা-বালিকাদের (Girl Guide) কমিটিকে ... ১০০৲

৮। বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলী (মহিলাদের মধ্যে শিল্প-শিক্ষা বিস্তারের জন্য) ১০০৲

৯। বিশ্বভারতীর পল্লী-সংস্কার বিভাগ (মহিলাদিগকে পল্লী-শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য) ১০০৲

১০। নিম্নলিখিত মহিলা-সমিতি দিগকে ধাত্রী-শিক্ষা বিস্তারের ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র স্থাপনার্থ এক একটি ফণ্ড প্রতিষ্ঠার জন্য দান :—

(১) পাবনা মহিলা-সমিতি .. .. ১০০৲

(২) বীরভূম " " ... ... ১০০৲

(৩) রামপুরহাট " " ... ... ১০০৲

(৪) বাঁকুড়া " " ... ... ১০০৲

(৫) দার্জ্জিলিং " " ... ... ১০০৲

(৬) শ্রীহট্ট " " ... ... ১০০৲

১১। বঙ্গের প্রতি জেলায় (এবং শ্রীহট্টের) মহিলাদিগকে, বিশেষতঃ বিধবা-দিগকে, অর্থকরী গৃহ-শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য এক বা ততোধিক পর্য্যটক শিক্ষকের বন্দোবস্ত করিবার একটী ফণ্ড প্রতিষ্ঠা-কল্পে ... ৬০০৲

১২। প্রতি বৎসর যে মহিলা-সমিতি বঙ্গ-প্রদেশের (এবং শ্রীহট্টের) মধ্যে কাজে বেশী কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবেন তাহাকে বাৎসরিক পারিতোষিক ৫০৲ দিবার জন্য ১০০

১৩। প্রতি বৎসর যে কর্ম্মী বঙ্গ-প্রদেশে (এবং শ্রীহট্টের) মহিলা-সমিতি সংগঠনে ও মহিলা-সমিতির কার্য্যের প্রসারে বেশী কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবেন তাঁহাকে বার্ষিক পারিতোষিক ৫০৲ দিবার জন্য ... ১০০

১৪। একটি কেন্দ্রীয় মহিলা-প্রতিষ্ঠান দ্বারা বঙ্গের (এবং শ্রীহট্টের) প্রতি সহরে এবং প্রতি বড় বড় গ্রামে মহিলাদের যুক্ত-চেষ্টায় স্ত্রীশিক্ষা, স্বাস্থ্যোন্নতি ও [illegible]ল-শিক্ষা বিস্তারার্থ এক একটি করিয়া মহিলা-সমিতি গঠন করিবার জন্য একটি ফণ্ড-স্থাপনার্থে ১০০

সমাপ্ত।